KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ১৮/২ [illegible] লেন, কল-৯ ৩০/২২ [illegible] রোড, কল-৩২
Collection : KLMLGK	Publisher : অভিজিৎ ঘোষ
Title : অন্বর্থ (ANWARTHA)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 2 3 4	Year of Publication : Feb - 1985 March - 1986 Jan - 1987
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : অতনু সরকার (2) অতনু সরকার, দিলীপ বিশ্বাস (3)	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

ঐশ্বর্য

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

এদিকের অনিয়মিত পত্রিকা

SOME OF OUR PUBLICATIONS

A STUDY OF UNIVERSALS *S. Sen*	30.00
LANGUAGE, STRUCTURE & MEANING *S. Sengupta*	46.00
ASVAGHOSA : A CRITICAL STUDY *B. Bhattacharya*	60.00
RASACHANDRIKA *S. N. Ghosal*	42.50
URBAN GROWTH IN RURAL AREAS *C. P. Mukherjee*	51.00
SAKAS IN INDIA *S. Chatterjee*	8.00
PROBLEM OF LAND TRANSFER *K. Mukherjee*	10.00
TAGORE'S EDUCATIONAL PHILOSOPHY *S. C. Sarkar*	7.50
CHARYAGITIKOSA *P. C. Bagchi & Santi Bhikshu*	15.00
ADHUNIK ORIYA KAVYADHARA *N. N. Misra*	42.00
CHATURDANDIPRAKASIKA *V. V. Wazelwar*	12.00
PRAKRITIR KABI RABINDRANATH *A. K. Sen*	3.00
SWARNAKUMARI O BANGLA SAHITYA *P. Sasmal*	34.00
RABINDRANATHER SATTADARSAN *S. Majumdar*	23.00
RABINDRAGRANTHA PARICHITI *P. K. Mukherjee*	15.00
MAHABHARATER SAMAJ *S. Bhattacharya*	55.00

RESEARCH PUBLICATIONS
VISVA-BHARATI, SANTINIKETAN

অ ন্ব র্থ

এ দিনের অনিয়মিত পত্রিকা

অশ্বত্থ

অনিয়মিত সংখ্যা ৩ মার্চ ১৯৮৬

পাঠক ভাবুন

অশিক্ষার মুখোমুখি ৩ অনীক রুদ্র

কবিতা

দূরত্ব ১২ দীপক গোস্বামী
একে একে সবাই চ'লে গেলে ১৩ অনল রায়
যাপনচিত্র ৩৯ অভিজিৎ লাহিড়ী
জাগরণ ৪০ মণিভূষণ ভট্টাচার্য
বারোমাস্যা ৪১ অভিজিৎ ঘোষ

অনুবাদ কবিতা

আই কিং-এর কবিতা ১৪ অমিত সরকার
লু লাই-এর কবিতা ১৫ সতীন্দ্র ভৌমিক

গল্প

এটা কোনো গল্প নয় ২৭ দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক
ভিনদেশী ৪২ জ্যোৎস্নাময় ঘোষ

প্রবন্ধ

নাস্তিকতার দর্শন ২১ পথিক বসু

সম্পাদক : অতনু সরকার দিলীপ বিশ্বাস
প্রচ্ছদশিল্পী : শমীন্দ্র ভৌমিক
দাম : তিন টাকা

অশিক্ষার মুখোমুখি

অনীক রুদ্র

কৃষ্ণচন্দ্র পন্থ উনিশশো পঁচাশির অগাষ্টে একটি দলিল প্রকাশ করেছেন। বর্ষা অধিবেশনে পরিবেশিত এই দলিল আত্মসমালোচনায় আর্দ্র বহুবিধ জনকল্যাণের বাণীতে বিভূষিত। শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণান, মুদালিয়র, কোঠারী প্রভৃতি কমিশনে বা গজেন্দ্র গডকর কমিটি গঠিত হয়েছিলো। কিন্তু একটু আলাদা ধরনের আমাদের বর্তমান এই দলিল, যা পেশ করেছেন শিক্ষা মন্ত্রক। স্বায়ত্ত শাসনাধীন প্রতিষ্ঠান হতে শুরু ক'রে শিল্পোদ্যোক্তা, আমলামন্ত্রী সহ সক্কলেই এর উপর বক্তব্য রাখবেন অচিরাৎ। কারণ ছিয়াশির মধ্যে একটা কিছু করতেই হবে— অনেক দেরী হয়ে গ্যাছে (১.৩৩ পরিচ্ছেদ পৃ: ১৩)। সাতচল্লিশের ক্ষমতা হস্তান্তরের পর মাত্র দুই বছরের মধ্যে সংবিধান নামক যে বস্তুটি তদানীন্তন কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ১৮% জনগণের রায় নিয়ে গড়ে ফেল্লেন তাতে আগামী দশ বছরের মধ্যে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত বালক বালিকাদের অবৈতনিক, সার্বজনীন শিক্ষার কথা নির্দেশাত্মক সংবিধানে ঠাঁই পেয়েছিলো। পরিশীলিত ভাষা, বিধান, প্রতিশ্রুতি চিরকালই শাসক শ্রেণীর অলংকার এ দেশে, যেমন লজ্জা অলংকার নারীর ; তাই ২০০০ সনের দিকে দৌড় দিতে গিয়ে আমাদের সীমায়িত জ্ঞানে আসে না শিক্ষা আবার ক্যামনে সার্বজনীন হবে ! জাতীয় আয়ের কতটুকু কোন পাশ্চাত্য দেশ (সমাজতান্ত্রিক বা ধনতান্ত্রিক) ব্যবহার করে সে প্রসঙ্গে না হয় নাই গেলাম। শিক্ষা বাজেট কমতে কমতে শূন্যে এলো ব'লে। ওদিকে সরকারী হিসেবেই তিনটি আদমশুমারী পেরিয়ে আমরা শিক্ষিতরা ৩৬·৩% এর আওতায় পড়ি। বিশ্বব্যাঙ্ক বলছে মাথা পিছু ৩০০ টাকা ঋণ নিয়ে জনসংখ্যার তালে তালে ২০০০ সনে আমাদের পরিসংখ্যান দাঁড়াবে ৪৫.১%। মনে রাখতে হবে পরিকল্পনার প্রথম যুগে শিক্ষা ছিলো সমাজসেবার অঙ্গ। বিভিন্ন পথে আজ তা মানবিক সম্পদ বিকাশের দন্তরুচি সুকৌমুদী রূপে হাজির হতে চলেছে।

যুব বর্ষের প্রাক্কালে যুবক প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা নিয়ে হুঙ্কার শোনা গিয়েছিলো।

কম্প্যুটার বিপ্লব, হাই টেকনোলজি ইত্যাদি শ্লোগানের মধ্য দিয়ে তিনি আধ্যাত্মবাদ-কাম উন্নত বিজ্ঞান বিষয়ক খসড়া প্রস্তাব সোফা-কাম-বেড মার্কা কর্মসূচীর নামে বারবার ঘোষণা করতে থাকেন। প্রয়োজন বোধে পূর্বসূরীদের নিন্দে করতেও পিছ-পা হননি। যদিও এমন বলিষ্ঠ আত্মসমালোচনা বা আজকের শিক্ষা বিষয়ক চিন্তা ভাবনা, যা তিনি পেশ করেছেন এক মন্ত্রী মারফৎ, তাকে বৈপ্লবিক ভাববার কোনো কারণ নেই। শোধনবাদী বামপন্থী শিবিরেও তাই গুঞ্জন 'পুরোনো কাসুন্দি নতুন বোতলে'!

সার্বজনীন শিক্ষা, আদর্শ স্কুল, বয়স্ক ও বৃত্তিমুখী শিক্ষা, বেসরকারী পরিচালনার শিক্ষা, মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ শিক্ষা সিলেবাস, শিক্ষার মাধ্যম, কেন্দ্ররাজ্য সম্পর্ক, শিক্ষাবাজেট ও কাঠামো ইত্যাদি কোন বিষয় নেই সেখানে এটাই সমস্যার।

'পরিচ্ছন্ন' প্রশাসনের প্রধানমন্ত্রী ধনতন্ত্রকে বাধা মুক্ত করতে চেয়েছেন। বলেছেন ব্যক্তিমালিকানার কথা। অবাধ ধনতন্ত্রে ধনবৈষম্যের সঙ্গে বেড়ে চলবে শিক্ষার বৈষম্য। তবে কি রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি শিথিল করা হবে, আমরা ফিরে যাবো ভিক্টোরীয় ধনতন্ত্রে? সপ্তম পরিকল্পনা তা বলে না। কারণ প্রায় ষাটভাগ অর্থ ব্যয় হবে সরকারী খাতে। অর্থাৎ অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা সংকুচিত নয়। তাহলে কেন ব্যক্তিগত উদ্যোগের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে? কারণটা আমাদের কাছে দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। সরকারী ক্ষেত্রে বিদেশী মহাজনী বুর্জোয়াদের তথা সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যবসার সুযোগ যেমন দেওয়া হবে দেশীয় পুঁজিপতিদের বা বিকাশমান বুর্জোয়াগোষ্ঠিগুলিকেও সুযোগ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে রাষ্ট্রের প্রসারণশীল ভূমিকা মার্গীয় ধনতন্ত্রের বিলোপের নামে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র বলবৎ করার চালবাজী মাত্র। উপনিবেশিক শক্তিগুলিকে সুরক্ষিত করতে আগুয়ান দেশীয় বুর্জোয়া বা সামন্তদের সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারে পরবর্তী ক্ষেত্রে আসছি। 'আমরা যখন বিনিয়োগের কথা বলছি, তখন সরকারী অর্থের কথা বলছি না; বলছি সেই অর্থের কথা যা দেশের দরিদ্রতম লোকেরা যোগান দিয়ে থাকেন। অযোগ্যতার দরুন যদি একটি পয়সাও নষ্ট হয়, তবে বুঝতে হবে দারিদ্র্য দূরীকরণ কার্যসূচী সেই পয়সাটি থেকে বঞ্চিত হোলো। এটাই আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। এই জন্যেই আমি আধুনিক কারিগরিবিদ্যা প্রয়োগের কথা বলছি (শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি— রাজীব গান্ধী তথ্য ও প্রচারমন্ত্রক, ভারতসরকার)। অর্থাৎ কম্প্যুটার বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রনির্ভরতা কায়েম করার পরিকল্পনা, উৎপাদন বৃদ্ধির নামে ঘোষণা

করা হচ্ছে; তাতে বিদ্যমান ব্যবস্থার সেবাদাসরা ব্যবসায়িক স্বার্থে এবং যন্ত্রী তৈরীর কাজে বেশী ক'রে নিযুক্ত হোক। উচ্চশিক্ষা হোক সংকুচিত, শিক্ষিত বেকার যাতে বিদ্রোহী না হয়। বিভিন্ন মানের শিক্ষাব্যবস্থা বজায় রেখে বেশীর ভাগের জন্য শিক্ষার উৎকর্ষতা কমানো হবে এবং বিশেষ একটি শ্রেণীর ক্ষেত্রে বাড়ানো হবে— মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বা বয়স্ক শিক্ষায় টিভি, রেডিওর আওয়াজ এই ইঙ্গিত বহন করে। বিলিতি পত্রিকায় রাজীব গান্ধীর উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— আসছে পাঁচবছরে ১'২৫ ডলার খরচ করা হবে রেলপথ, ব্যাঙ্ক, বিমানপথ প্রভৃতিকে এই যন্ত্রগণকের আওতায় আনতে। সরকারের নাকি আরো ইচ্ছে বিদ্যালয়গুলিতে যন্ত্র বসিয়ে ভারতীয়দের কম্প্যুটার মনোবৃত্তি জাগানোর। অবশ্য ওই কাগজেই ফিচলেমি ক'রে মন্তব্য করা হয়েছে পাঁচটির মধ্যে দুটি স্কুলে এখানে ব্ল্যাকবোর্ড নেই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অধ্যাপক আমেদ বলেছেন, আমাদের শিক্ষা প্রণালীর ভিত জর্জরিত। শিক্ষকেরা তাঁবু আর গাছের নীচে ব'সে পড়ান। ছাত্রদের শ্লেট পেন্সিল বইখাতা নেই। তবু নাকি প্রত্যেক রাজ্যেই আমাদের উৎকৃষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা উচিত। শিক্ষা সকলের নয়। আর উচ্চশিক্ষায় তাদেরই অধিকার যারা তা পাবার ক্ষমতা রাখে। শিক্ষার গুণগত মান ক'মে যাচ্ছে। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 'উৎপাদন' আর ব্যবসায়িক শিল্প প্রতিষ্ঠানের 'চাহিদার' সমতা দরকার। প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষা নীতি অবশ্য একথা নতুন ক'রে বলেনি। এই শতকের গোড়ার দিকে কার্জনের আমলে টি. র‍্যালের সভাপতিত্বে ১৯০২ সালে যখন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন হয় আমরা এই সুর শুনেছি প্রথম ও সরাসরি-'In all matters pertaining to higher education, efficiency must be the first and paramount consideration. It is better for India that a comperatively small number of young man should receive a sound liberal education than that a large number should be passed through an inadequate course of instruction leading to a depreciated degree. তৎকালীন কংগ্রেসীরা অবশ্য এই নিয়ে অনেক চেল্লাচিল্লি করেছেন গণতন্ত্রের পক্ষে, আজকে চুপ ক'রে গেছেন অন্য কোনো প্রয়োজনে। শিক্ষাক্ষেত্রে নয়। বিপ্লব সাধিত করার ভার নিচ্ছেন তাই বুর্জোয়া শিক্ষাবিদ বিশিষ্ট আমলা ও শিল্পপতিরা। সাতচল্লিশের ডমিনিয়ন মর্যাদার নাগরিক হিসেবে আসুন আমরা এবার দৃষ্টি ফেরাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা বিজ্ঞান

সংস্কৃতি দপ্তরের তথ্যপত্রের দিকে (১৯৮১ : ১১৭)...'organizational measures involved in the setting up of co-ordination and advisory bodies at various levels as well as in the establishment of new structural units with in both the higher education institutions and the production sector...this may cover...the rights and procedure of election of business managers into the higher education institution governing boards.' আজকে তাদের জল্পনা কল্পনা থেকে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না 'বিপ্লব' কারিগরি কৌশল আর কম্প্যুটারের জন্যে—অন্যকথায় ব্যবসাদারদের মুনাফার জন্যে। এমন আশা করা হচ্ছে উনিশশো নব্বই সালে ইলেকট্রনিক্‌স্ দ্রব্যের উৎপাদন হবে দশহাজার কোটি টাকার। সি. পি. এমের তাত্ত্বিক নেতা দশরথদেবের মতে, রপ্তানী ক'মে আমদানী বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডারে সংকট দেখা দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বহুজাতিক সংস্থা তার উপর চাপাচ্ছে জনবিরোধী শর্ত।' অথচ পশ্চিমবাংলার লালমন্ত্রীরা প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি এবং রাজীব সরকারের শিল্পনীতির বিরোধিতায় চিঁ চিঁ করলেও বিদেশী পুঁজি বা সুদে আমদানী করা হাইটেকনোলজি নিয়ে উচ্চবাচ্য করেননি, পরন্তু স্বরাজ্যে তাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে কি এর মাধ্যমে তারা সাম্রাজ্যবাদকে সুরক্ষিত করার দায়িত্ব নিচ্ছেন?

এতদিন যা কৌশল ব'লে চালানো হোতো আজ তা ছল ব'লে ধরা পড়ছে। কেননা, এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল ভণ্ড বামপন্থীরা বিদ্যমান ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে বা মোলায়েম করতেই এসেছেন। দ্বাদশ কংগ্রেসে তাদের ভাষণ আরও গম্ভীর।...এই শিল্পনীতির ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের সাথে কিছু করার নেই! সি পি আই (এম) এর পার্টির এই দলিল শুধুমাত্র তাত্ত্বিক দেউলিয়াপনাই দেখায় না যে কোনো বৃহত্তর লক্ষ্যে সমাজপরিবর্তন রাজ্য সরকারে আসীন থেকে করা যায় না তাও প্রমাণ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া শিক্ষানীতিকে নিরক্ষরতা বৃদ্ধির রণনীতি আখ্যা দিলেও এর বিরুদ্ধে পাল্টারণ ঘোষণা করার হিম্মৎ ও সৎসাহস তাদের বড়ো জোর পশ্চিমবাংলার বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতির সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। পিপলস্ ডিমোক্র্যাসী পত্রিকায় পরিশেষে বামফ্রন্টের রেকর্ড নিয়ে বক্তব্যে বলা হচ্ছে তারা নাকি কলেজ গভর্নিং বডিতে শিক্ষক ছাত্র ও কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ক'রে গণতন্ত্রের সেবা করছেন।

অবশ্যই তারা বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজস্তরে এই সমস্ত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে স্থিতাবস্থাকেই রক্ষা করছেন এবং সরকার মনোনীত প্রতিনিধি রাখা, নতুন কায়দায় প্রশাসনিক ব্যাপারে ছাত্র প্রতিনিধিদের জুড়ে দেওয়া। ইত্যাদি কর্মসূচীতে সস্তা হাততালি কুড়োনোর ধান্দা করেছেন যা ছাত্র আন্দোলনকে পেছন থেকে ছুরি মারছে। তাদের শিল্পনীতি বা শিক্ষা আন্দোলন নিয়ে কাগুজে খেলা থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার যে গণশিক্ষার দাবীও সংশোধনবাদীদের শূন্যগর্ভ বাক্যমাত্র। মোদ্দা কথা হোলো ক্ষমতার কাছাকাছি থেকে ছোটো বড়ো ব্যবসায়িক বা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মুঠো শক্ত করা এবং শিল্প বা শিক্ষার ননীমাখনটুকু সংকীর্ণ গোষ্ঠি স্বার্থে যথাসাধ্য ব্যবহার করা।

এবার যদি আমরা ধ'রে নিই যে গণশিক্ষা বর্তমান সমাজে শাসকশ্রেণী চালু করতে পারে না তাহলে সেই সমীকরণ অনুযায়ী সামান্য কিছু প্রযুক্তিবিদ উৎপাদন বা অসাধারণ গুণাবলীর গুরুত্ব দিতে বাধা কোথায়? দুন স্কুল, সেন্ট জেভিয়ার্স, রামকৃষ্ণ মিশনের সংখ্যা বাড়েনি; অন্তত গ্রামে গঞ্জে তাদের শাখা বিস্তারের সুযোগও কম। প্রতিটি জেলায় যদি একটি করে সরকারী খরচায় আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় তাহলে বিত্তবান সামন্ত, বিকাশশীল বুর্জোয়া গোষ্ঠী প্রমুখ যাদের অর্থক্ষমতা থাকলেও অসুবিধে থাকে বাড়ির ছেলেপুলেদের দূরের নাম করা স্কুলে পাঠাতে, তাদের সুবিধা হয় বেশী। কারণ সরকার যদি এ যুগেও এই বিত্তবান বা উচ্চবর্ণদের কেবলমাত্র গ্রামে মফঃস্বলে পড়ে থাকার জন্য অবহেলা করেন, অবলীলায় তারা সরকার ওল্টানোর ব্যবস্থা নিতে পারেন। বর্ণের কথাটা আমরা এতটুকু অপ্রাসঙ্গিক ভাবতে পারিনা বরং শ্রেণীস্বার্থের ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। গুটিকয়েক ব্যতিক্রম ছাড়া শিক্ষায় বাবুবাদ আসাটাই প্রকট যা শ্রেণী বা বর্ণের সঙ্গে পাশাপাশি সম্পর্ক রাখে। আমাদের পশ্চিমবাংলার 'বামপন্থী' বাবুদের দিকে দৃষ্টি ফেরালেও বামুন, কায়েত বা বদ্যিদেরকেই দেখা যাবে।

প্রতিভাবান বালক-বালিকাদের উন্নতমানের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হবে, পিতামাতার অর্থ নৈতিক অবস্থা যাই হোক না কেন (৪.২৩, পর্ব চার)। কিন্তু কারা এই অসাধারণত্ব নিয়ে আসবে ওই বিদ্যালয়ে? অবশ্যই তারা হরিজন বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের নয়। তারা হোলো উল্লিখিত বিত্তবান সামন্ত তথা সবুজ বিপ্লবের অংশীদার ধনী কৃষকের সন্ততি বা প্রতিষ্ঠিত ও উচ্চবর্ণের। সেইসব বিদ্যালয়ে অঙ্ক আর বিজ্ঞান বিষয় শিখতে হবে ইংরাজীতে, ইতিহাস-ভূগোল হিন্দীতে। মাতৃভাষায় পাঠ নয়। উদ্দেশ্যটা হোলো ঔপনিবেশিক শাসনের

উপযুক্ততায় নবপ্রজন্মে তাঁবেদার শাসক শ্রেণীকে এখান থেকে বের ক'রে আনা। শোধনবাদীরা কেউ কেউ পরিসংখ্যান দিয়ে বলছেন পনেরোশো ভাষা আছে আমাদের দেশে, তাই মাধ্যমটা মাতৃভাষায় হোলে (নাকি হিন্দীর বদলে আঞ্চলিক বুর্জোয়াদের ভাষায়!) খুব যে আপত্তিকর হবে তা হয়তো নয়। শিক্ষাকে তাই যুগ্ম তালিকা হতে রাজ্যতালিকায় ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী তুলছে তারা। একথা ভুললে চলবে না বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতির সম্বন্ধে কিছু মানুষের যতই দুর্বলতা থাক, তাদের শিক্ষানীতি বাবু শ্রেণীর উৎপাদন অব্যাহত রেখেছে: ঢাকঢোল পিটিয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পাশাপাশি গড়তে দেওয়া হয়েছে অসংখ্য ইংরাজী মাধ্যমের বিদ্যালয়। সচেতনভাবেই তারা বৈষম্যমূলক শিক্ষা বজায় রেখেছে। সার্বজনীন শিক্ষার ব্যাপারে রাজ্যসরকারগুলি আদতে ব্যর্থ হয়েছে। কেন্দ্রীয় আদর্শ বিদ্যালয় নতুন ক'রে শিক্ষায় শ্রেণীভেদ আনছে না। শ্রেণী বৈষম্যকে প্রকট করছে মাত্র। খানকতক এই রকম আদর্শ বিদ্যালয়ের বাইরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষাদান পদ্ধতি নিম্ন মানের হবেই। আবার প্রধানমন্ত্রীর মতে এটা হচ্ছে, বাকি ব্যবস্থার প্রতি নিছক একটা চ্যালেঞ্জ, যাতে সব স্কুলই একই স্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে পারে। অসাধারণত্ব ছাড়া সঠিক সুফল পাওয়া যায় না ইত্যাদি।

এইরকম মন্তব্য আর যাই হোক প্রাক্তন বিমান চালকের পাগলামি নয়। আমাদের ভাবতে হবে একটি শ্রেণী কোন্ অবস্থায় দাঁড়িয়ে এরকমের চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। এ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার একমাত্র অর্থ হয় শ্রমজীবি অগাণন মানুষের প্রতি নির্মম তামাশা। একে দৃঢ় হাতে মোকাবিলার জন্য স্বাধীন নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

মানবিক সম্পদ বিকাশে বয়স্কদের শিক্ষা দেবার খাতে সরকারের একটা ছোটোখাটো অঙ্ক ব্যয় করার পরিকল্পনা আছে। যে অর্থ চোখে-দেখা-কানে-শোনা (Audiovisul) পদ্ধতির যন্ত্রপাতি কেনার জন্য খরচ হবে। রেডিও, টিভি, বা ভিডিও নামের আমদানী করা টেকনোলজি ক্রয় ক'রে যেমন চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির স্বার্থ রক্ষিত হবে, শহরতলী বা গ্রামের নিরক্ষর মানুষদের কাছে সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রয়োজনীয় উপকরণ সুবিধে মতো সুযোগ মতো প্রচার করা যাবে। বয়স্ক শিক্ষার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করার বাড়তি ব্যয় কমাতে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে আগ্রহী ক'রে তোলার কথাও বলা হচ্ছে। মিশনারী সংস্থাগুলি হয়তো আবার নতুন উদ্যমে উঠে পড়ে লাগবে, সেই সঙ্গে ব্যক্তিমালিকানার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে।

আর একটি পরিকল্পনা হোলো দক্ষ শিক্ষক বানানো। যা বুদ্ধিজীবিদের সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করবে। উৎপাদনে দক্ষ শ্রমিকের মতোই তাদের নিযুক্ত করা হবে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিতে। যদি মেনে নেওয়া যায় বর্তমান শিক্ষকদের মধ্যে দক্ষতার অভাব আছে, তাদের অর্থনৈতিক অসুবিধা কোনো সমস্যাই নয়—তাহলে প্রয়োজন হচ্ছে এই সমস্ত দক্ষ শিক্ষকদের পিছিয়ে পড়া স্কুলগুলির দায়িত্ব দেওয়া। শাসক শ্রেণীর মুশকিলটা এখানেই।

বৃত্তিশিক্ষা নিয়ে অনেক ধানাইপানাই-এর পর বোঝা যাচ্ছে, বৃত্তিশিক্ষা দিয়ে যেহেতু চাকরীর সুযোগ সৃষ্টি করা যাচ্ছে না তাই, দুনিয়ায় মোকাবিলা করার উপযুক্ত ক'রে বৃত্তিশিক্ষার্থীদের তৈরী করার কথা বলা হচ্ছে। বস্তুত: বৃত্তি-শিক্ষা ব্যর্থ হয়েছে। আগামী পাঁচ দশ বছরে যে সব পরিবর্তন আসছে তাতে অশিক্ষিত নিরক্ষররা পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান, বৃহৎ শিল্পে সাধারণ শ্রমিকের চাকরীও পাবে না—এই রকম হুঁশিয়ারী রাজীব শুনিয়েছেন। নিশ্চয়ই আগামী পাঁচ দশ বছরে জনসংখ্যার অর্ধেকের অনেক বেশীই থাকবে নিরক্ষর; তাহলে এই ভুখা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতাসৃষ্টির চ্যালেঞ্জকে আমরা কিভাবে মোকাবিলা করবো? ঔপনিবেশিক শাসন তার প্রয়োজন অনুযায়ী মুষ্টিমেয় লোকজনদের বৃত্তি বেছে দেবে। কিন্তু বাকীরা? তাদের খিদের মোকাবিলা করতে আনা হবে পাকিস্তানী মডেলের মিলিটারী গণতন্ত্র। মার মুখে তবু সমাজতন্ত্রের ধ্বনি মাঝে মধ্যে শোনা যেত, পুত্র সেটুকুও বর্জন করেছেন।

মস্তিষ্ক-ব্যাঙ্ক শব্দটি কিছুটা নতুন। আগে বলা হোতো মগজ চালানো। উন্নত সম্প্রদায়ের মানুষ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের উন্নত মস্তিষ্ককে স্বদেশে এসে যথার্থ ব্যবহার করবে। একসময় শাসক শ্রেণীর মধ্যে কিছু উদারনৈতিক বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের অবস্থানের জন্য সরাসরি যে কথা বলা যেত না, পরিচ্ছন্ন সরকারের আওয়াজে তাদের নস্যাৎ ক'রে সেই জায়গা ব্যবহার করছে ক্ষমতাসীন শক্তি। অন্যকথায় সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহকরা এখন অনেকটা সংহত।

১৯৭১ সালে প্রথম যুক্ত রাজ্যে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয় এবং জন-প্রিয়তা অর্জন করে। পারী থেকে প্রচারিত UNESCO পুস্তিকায় বহুপূর্বেই ভারত সহ তৃতীয় বিশ্ব এবং উন্নতদেশগুলির শিক্ষা ব্যবস্থাতেও মুক্তবিশ্ববিদ্যালয়ের 'আইডিয়া' দেওয়া হয়েছিলো। আমাদের আজকের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির বহুবিধ ব্যাপার স্যাপার যেমন জীবনব্যাপি শিক্ষা, উচ্চশিক্ষার চ্যালেঞ্জ প্রভৃতি

নক্‌শাও সেখানে ছিলো। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হোলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে, ব্যবসায়িক সংস্থাকে, পৃথিবীজুড়ে এই Non-traditional post-secondary Education-এ আগ্রহী ক'রে তোলার কথা। "In some instances, institutions or programmes rely mainly on tuition fees and/or on private funds and this is true of Ireland, Israel and India" (Worldwide Inventory 1980, Financial measures P-16) এবং "... The traditional (university) sector of higher education is financed exclusively out of public funds in the countries with centrally planned economies, but are financed by both public and privatesources in other societies." (A DIGEST OF UNESCO STUDIES ..by Good ridge & Layne) ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের তুলনার প্রশ্ন আসে না তবু বুঝতে অসুবিধে হয় না সরকারের এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কোথায় নিহিত এবং কোন শক্তি দ্বারা পরিচালিত। লুনাচারস্কি একসময় বলেছিলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি শিক্ষাই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষেত্র যেখানে আমরা আমাদের সম্পদের বিনিয়োগ করতে পারি'। এবং বলা-বাহুল্য সেটা ব্যক্তি-মালিকানার নয়। গুণগত দিক দিয়ে মুক্তবিশ্ববিদ্যালয় নামের নিচু মানের শিক্ষা-ব্যবস্থা থাকবে সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য। অপরদিকে অল্প কিছু সংখ্যক সেরা শিক্ষা কেন্দ্র। সরকার আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ সৃষ্টি করছে না। বেসরকারী কারবারীরা তাদের প্রয়োজন মাফিক নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বানিয়ে নেবে।

তৎসহ চাকরি থেকে ডিগ্রী আলাদা হ'লে নেপোটিজমের রাস্তা হবে সুগম। কারণ মানগত শিক্ষায় বৈষম্য এনে প্রতিযোগিতার ক্ষীণতম জায়গা হবে ধ্বংস আর প্রয়োজন অনুযায়ী সৃষ্টি করা যাবে সীমায়িত চাকরীর সুযোগ। যা নষ্ট করবে ডিগ্রীর কাগজ-মূল্যটাকেও।

সর্বশেষ আরো এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোলো শিক্ষাকে কেমন ক'রে, এবং কত খানি রাজনীতি থেকে মুক্ত করা হবে? এই প্রসঙ্গে সংসদীয় বিভিন্ন দলগুলি ক্ষুব্ধ। যদিও তাদের ক্ষোভটা ভাগ বসানোর অসুবিধায় তথাপি স্বৈরতান্ত্রিক একনায়কসুলভ চিন্তাচেতনা দ্বারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিচালনা করার যুক্তি রাজনীতি বিতাড়নের নামে ছাত্র আন্দোলনকে মুছে দেওয়ার যুক্তি বা পুলিশ নিয়ন্ত্রণে রাখার পরিকল্পনা, সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাকে সুরক্ষিত করার ছদ্মনাম মাত্র। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যটি ভারি চমৎকার—সামাজিক

উত্তেজনাকে প্রশমিত করতে হবে এবং দেখতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা তা যেন প্ররোচিত না হয়।

আমাদের পচনশীল সমাজে বঞ্চনা, শোষণ, দমনপীড়ন আরো তীব্র হবে। প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতির চটকদারী কথায় সমাজব্যবস্থার দূষিত ক্ষতে যতই মলম লাগানোর চেষ্টা হোক না কেন সংগ্রামী মানুষেরা ঠিক ধ'রে ফেলছে—বিকিয়ে যাচ্ছে জন্মভূমির মাটি। তাই শোধনবাদী বিভ্রান্তি নয়, প্রিয় পাঠক, নিরক্ষরতার মুখোমুখি আপনিও কি দায়বদ্ধ নন এই ব্যবস্থা বিরোধী যুদ্ধ শিবির গড়ে তোলার?

দূরত্ব

দীপক গোস্বামী

দূরে গেলে হাতে পেনসিল ছাড়া কিছুই থাকে না।
অথচ সরল ক'রে যা যা থাকে, তাতে
সহজেই আনা যায়, স্মৃতি ভেজা নরম বিকাল,
পুরাতন কিউরিওশপ, ঝিমধরা রানওয়ে— রাত,
শুধু প্রখর সত্যের মত ইচ্ছাটুকু গোপন থাকে না।

ভেতরে গোপন বীজ, অসহায় মাটি খুঁড়ে ক্রমে
একে একে স্বাধীন ইচ্ছারা ভেসে যায়, মাঝ রাতে
দৃষ্টিহীন বাউলের মত সমস্ত শরীর বেয়ে নামে
পরিচিত গন্ধের ঢেউ, হারানো রুমাল,
নির্জন পাহাড়ের ঢালে অন্তহীন মনসা-ভ্রমণ।

যদিও মধ্যবর্তী দূরত্বটা শ' দুই মাইল
শীত ও বসন্ত বুকে পাখীদের নিত্য যাওয়া আসা,
একা একা কর্মহীন, উত্তরের হাওয়া এলে
মনে হয় তোমার আকাশ, ম্লান দীর্ঘশ্বাস আর

দূরে গেলে খুলে যায় হৃদয়ের দ্বিতীয় দুয়ার ॥

একে একে সবাই চ'লে গেলে

অনল রায়

একে একে সবাই চ'লে গেলে শীতসন্ধ্যায়
চোখ ফিরে আসে অনন্ত আকাশ ছুঁয়ে
যতদূর দেখা যায় ততদূর ঘুরে
দেয়াল দেখায় ছবি ক্ষীণ আলোতে তখন।

বাগানের গাছগুলি নেড়া, বেআব্রু দাঁড়িয়ে
প্রিয় শব্দগুলি আড়াল টেনেছে কবে যেন।
কোথাও ফেলে এসেছি তাকে কতদিন হল
আজ মনে পড়ে।
মোহমুদ্গার হাতে কে আসছে এগিয়ে
যাও চলে যাও
ভাসছে ভীষণ ভাসছে আমার চারপাশ
আজ মনে হল।

একে একে সবাই চ'লে গেলে শীতসন্ধ্যায়।

॥ অনুবাদ কবিতা ॥

আই কিং

এখানে অশ্বাদির সাজসরঞ্জাম পাওয়া যায়

'এখানে অশ্বাদির সাজসরঞ্জাম পাওয়া যায়'
সাইন বোর্ডে ঝুলছিলো কথাগুলো।
বস্তুত ওখানে বিক্রী করা হয় মানবিক জ্ঞান।

— ওহে দোকানী, আমি একটা চাবুক চাই।

এখান থেকে নিন। পছন্দ করুন। এটা দেখছেন— এটা গাধাকে মারবার
জন্য— এটা ঘোড়াকে। আর এই যে ছোট্ট হাতল অথচ কত লম্বা!
এটা দিয়ে উটকে শায়েস্তা করা হয়।

বৈচিত্র্যময়! সুন্দর! অপরূপ প্রতিটি।

দেখুন, এধারটায় আছে লাগাম, জোয়াল; আর ওটা দেখছেন—
কড়িয়াল বলে, লাগামকে ঘোড়ার দাঁতে বাঁধা হয় ওটার মাধ্যমে।
ক্ষুর যাতে ক্ষ'য়ে না যায়, ক্ষুরের নীচে লাগানো হয় এই ধাতবটুকরোগুলো

লাগাম পাওয়া যায়
শন দিয়ে, তালপাতার আঁশ দিয়ে তৈরী লাগাম।
সুন্দর, বর্ণময় লাগাম।

ওগুলো হচ্ছে রেকাব, ওতে ভর দিয়ে মহিষ ওঠে ঘোড়ার পিঠে। তামার
ঘণ্টাগুলো বেঁধে দেওয়া হবে উটের গলায়— মরুভূমির উপর দিয়ে
ওরা যখন হেঁটে চলবে, হাঁটবে; বিমর্ষ ঘণ্টাগুলো বাজবে—টুংটুংটুংটুং
আর এই ব্যাগগুলো ভর্তি করা হবে পণ্যে, হতভাগা গাধাগুলো
অবিশ্রাম বইবে ওগুলো।

জিন পাওয়া যায়।

মিশকালো মোষের চামড়ায় তৈরী
লাল বার্নিশে রাঙানো, ব্রোঞ্জ পিতলে খোচিত জিন।

রঙীন ঝালরগুলো দেখুন। ঘোড়ার কেশরঝাড় কেমন বিন্যস্ত হয়েছে
ঝালরে। আর এই ঝালরগুলো, গণ্ডারের রক্তিম কেশগুচ্ছে তৈরী।
নকশা তোলা জিন ঢাকা কাপড় দেখুন।
এ সমস্তই অপূর্ব সাজিয়ে তুলবে আপনার পশুকে, স্বপ্নময় করে তুলবে।

বৈচিত্র্যময়! সুন্দর! অপরূপ প্রতিটি।

প্রবঞ্চনায় এ যেন ইন্দ্রজালকে হার মানায়।
ধর্মের চাইতে এ যেন অনেক চতুর।
নিষ্ঠুরতায় এ যেন ধ্বংসকে হার মানায়।
আইনের চাইতে এ যেন অনেক অনেক দৃপ্ত।

'এখানে অশ্বাদির সাজ সরঞ্জাম পাওয়া যায়'
সাইনবোর্ডে ঝুলছিলো কথাগুলো।
বস্তুতঃ ওখানে বিক্রি করা হয় মানবিক জ্ঞান।

অনুবাদ: অমিত সরকার

লু লাই Lu Li

জন্ম ফুজিয়ান ১৯১৪। পরিবারের সঙ্গে মাত্র তিন বৎসর বয়সেই ভিয়েটনাম যান এবং ১৮ বৎসর বয়সে ১৯৩২ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে চলতে চলতেই তিনি সনিষ্ঠ অনুশীলনের ফলে খ্যাতিমান কবি হিসাবে পরিচিত হন। এখন লু লাই চীনা লেখক সমিতির তিয়ানজিন শাখায় কর্মরত আছেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ ৭টি। গণসাহিত্য প্রকাশন ভবন, বেইজিং থেকে প্রকাশিত তাঁর কাব্য গ্রন্থের ভূমিকা থেকে কতিপয় ছত্র তুলছি:

It is my own view that the primary factor in determining a work's value is not artistic form but content. The celebrated poets of the Tang dynasty (AD 618-907) each produced their own unique works though they all kept to the same poetic rules and rhyme scheme.

"How can you catch tiger cubs without entering the tiger's lair."

Without a broad experience of life, one cannot understand and properly reflect reality. This is a common-place, but it is true.

কোনো শেষ রাতে Late One Night

গোবরাট ডিঙিয়ে চাঁদের ঢেউ এলো
দিনের আলো ভেবে
দরজা খুলে দেখি শেষরাত

উত্তুরে হাওয়া তাড়াতাড়ি এসে
চাঁদকে ধাক্কা লাগিয়ে বসলো
আমিও ভোরের শব্দ পেলাম

গিরিছায়ার বাহুলীনে শুয়ে আছে তটভূমি
নক্ষত্ররা ফিরে গেল দিগন্ত পেরিয়ে
মনে হোলো পৃথিবী এখনো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন
এবং আমিই প্রথম তাদের ঘুম ভাঙাবো !

কুয়াশা Mist

কুয়াশা নিদ্রিত ছিল উপত্যকায়
সূর্য এসে দিল ওর ঘুম ভাঙিয়ে
একটি পবিত্র কোমল কিশোরী

চুল না গুছিয়েই ফিরে গেল
আবেগপ্রবণ ঘাসের চোখে জল রেখে
উপত্যকাকে সে দ্রুত বিদায় জানালো

গ্রীষ্মাকাশে একটি সাদাগোলাপকে
স্বাগত জানাবার জন্য ক্রমশ সে
আকাশে উঠে সূর্যালোকে মিশে গেল।

অনুবাদ : সতীন্দ্র ভৌমিক

এটা কোনো গল্প নয়

দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক

"মানুষের চেতনা তার সামাজিক অস্তিত্ব নির্ধারণ করে না, মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনার মর্মপ্রদেশ।"

আমি দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক। প্রাক্‌গাল্পিক মুহূর্তের চিন্তাগুলিকে ঝাঁকান দিতে গিয়েই ঝাঁপ দিয়ে যায় বিপরীত ঘটনাবিন্যাস। হাঁফিয়ে ফেলি নিজেকার বৃত্তবলয়ে চতুর্পাশ আর আবক্ষ ঢেউ নিয়ে এক-এক মুহূর্ত থেকে ছল্‌কে নেমে যাই অচিন শরীর নুয়ে। মুহূর্ত-প্রান্তে দাঁড়াবার সব ক্ষণিকই বিষাদখিন্ন। 'সরে যাও, সরো' বলতে বলতে যেন হুদ্দাড় শরবন দিয়ে ঝড় ঠেলে যায়। এইসব স্বপ্ন হ'তে-হ'তেও দুম্ ক'রে ঘরের ভিতর, একেবারে আপাদমস্তকে যাকে ঘরের আব্রু ব'লে ঠেকিয়ে রেখে দি, অসংখ্য ভিড় থেকে কেবলি ঢুকে পড়ে সে, সে-ই।

প্রবেশ মুহূর্ত থেকেই অচেনা সে। পুরুষের যা যা থাকলে তাকে নারী বলা যাবে না এমন কোনো তুল্য-প্রভেদ নেই অথবা এঁটেল মাটির মতো পা-হড়কানো যেমন-আকার নারীত্ব ঝলক নেই। তার সঙ্গে হাঁটতে গেলাম বনপথ। নির্জন সময় ফিরিয়ে দিয়ে সে তখন অন্য পথে ভ্রমণবিলাসী। কিংবা দঙ্গল বন্ধুর ঝাঁক থেকে তুলতে গিয়ে সেদিনই সে ঘরে ফেরার পর পিঠটান। সে কি মাকে চেনে? বাবা? বাবলি-আণবিকা-মহুয়া-ইতি-শম্পাকে? পিনা-স্বরীর-ভাই-বিপ্লব-নিতুদের? এদের নিয়ে ঘিরে-থাকা আমি-সে। কিন্তু আমাদের ঘিরে-থাকা সে প্রায়শ অন্যমনস্কে চলে কই কোনো দিন কোনো কোনো কখন অবেলা কালবেলায়?

রাসবিহারী ধ'রে বালিগঞ্জ ত্রিকোণ পার্কের দিকে হাঁটছিলাম এক বৈকালিক শরৎ-সন্ধ্যায় আমি-মহুয়া। মহুয়ার জরুরী ছিল। আমার নয়। নেহাৎ অব্যস্ত মানুষেরা এ পৃথিবীতে ভীষণ জরুরী দেখায়। সেদিনও নিশ্চিত মহুয়া তাকে দেখে নি। অবশ্য, বুঝেছিলো কি? সেইদিন আমি মহুয়ার থেকে এক হাত-চিঠি পেয়েছিলাম যার শেষ লাইন এরকম চপল-জোলো :

আমার শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা আজীবন তোমার সঙ্গী থাকবে। সাথী হিসেবে, আপনার জন হিসেবে তাকে গ্রহণ কোরো; নির্দয় হাতে ফিরিয়ে দিও না। ইতি—

সে, স্পষ্টত পরিচয়হীন, 'শুভেচ্ছা'য় সজোরে লাথি কষিয়ে যখন সহযোগিতা-

শব্দে আরো ভয়ংকর ঘৃণ্য অভিব্যক্তিতে ফেটে পড়তে চাইছিলো তখন পূর্ণিমার চাঁদ কোলকাতার শ্বাস দীর্ঘ ক'রে ছড়িয়ে দিল লোডশেডিং-এর ভিতর শুয়ে-থাকা ঘরবাড়ি-দোকান-রোড-যানজট। সে যখন-যেখানে বেশ্যার উপস্থিতি সম্বন্ধীয় ব'লে ফেলে চিৎকারে 'দ্রৌপদী ঘামে-ভেজা এ শহরে আর থাকিব না', আমি নিশ্চিত বুঝি সে তখন তীব্র প্রেমিক ও কবি। আমি সময়ের বাস সময়ের ট্রেনে খড়দহ স্টেশন থেকে এক মাইল হেঁটে ঘরে ফিরি। এক মাইল বাস-রিক্সার পকেট-রেস্তোঁ প্রায়শ সম্ভব নয় এই টনটনে বোধ সত্ত্বেও ঘরে বাবা-মা-দাদার উপস্থিতি বিশাল শূন্যের সঙ্গে যোগবিয়োগ করে। হায় বিংশশতাব্দীর শেষার্ধ তুমি সত্যিই গর্ভক্ষম কি-না একবার সঙ্গম করে দেখে নিই এসো। প্রেম-প্রীতি-স্নেহ মেলার শেষের মাঠের মতো শালপাতা-ব্যবহৃতকাগজ-মরাঘাস-মৃতফুল-সিগারেট-বিড়ি-ভাঙাদ্রব্য বাতাসে ওড়ায়; খা খা খান খান শব্দে কোথায় ধায় সেইসব? অথচ সে ওদেরই প্রয়োজনে বিলাপস্বরে কোনোদিন শুধু আলসেমি ক'রে আমার সঙ্গে সহবাস ক'রে থাকে; অনুদ্দেশ একের পর, একের এক পর, এক এক একের পর ক্রমসঞ্চারো জলের আলস্যে টলোমল চলমান—চলোচ্ছল ছলোচ্ছল···

পিনাকেশ ছিল। সিদ্ধার্থ। আমরা দুচোখে দেহ-জীবিনীদের নিরুত্তাপ উগ্রতা ঠেলতে ঠেলতে ঘিনিয়ে-ওঠা জিহ্বার আড়ষ্ট-অনার্দ্রে একে অপরের চেয়ে দ্রুত পথের মোড়ে এসে ধাবমান শ্যামলিমা বালিকার মুখ দেখেছিলাম এক ঘরের জানলার মাস্তলে। আমাদের তখন ওষ্ঠ কোথায় ছিল, সে কি জানিত খোঁজ?

দোতলা পানাগার। তিনজনে ঘিরে নেই তিনটি গেলাস। সে আচমকা উপস্থিতহীন টানে বড়োজোর নীল নীল আকাশের অন্ধ তমসাতে। সংলাপ হয়েছিলো এরকম!

পিনাকেশ: কবিতা লিখছিস? [আমাকে। অন্য কোনো সময় কবিতা-বিষয়ে ওর অনাগ্রহ না হোক আগ্রহ নেই]

আমি চুপ।

সিদ্ধার্থ: এই খিদিরপুর দেখছিস—স্মাগলিং, বেশ্যা আর মদের অবাধ ব্যবসা। তোরা তো জানিস পুলিশ এস. আই মেহতার হত্যাসংবাদ। অনেক দেখার আছে রে দ্বিজেন—তোকে সব দেখাবো একদিন।

আমি: আমার নিশ্চই এইসব দেখা জানা ও সেইসঙ্গে বোঝার ইচ্ছা আছে। এখানকার জীবন, মানে এই-যে ব'য়ে যাওয়া দিনগুলি রাতগুলি···

পিনাকেশ: আমি কেমন হেঁদিয়ে যাচ্ছি শালা! দ্বিজেন তবু তো ভাবে। তুই সিদ্ধার্থ?

সিদ্ধার্থ: একটা গল্প লিখেছি। শিল্পের কমিটমেণ্ট আর ফর্মের উপর একটা বিষয়ীগত সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা আছে। আসলে আমাদের শিল্প চর্চায় সাধারণত জৌলুশের টান। আমি বামপন্থী শিবিরে। আমার কাছে গল্পের কাঠামোর চেয়ে বিষয়ের টান বড়ো।

আমি: তোর কথা স্ববিরোধী। [তর্ক উঠতে পারতো। পিনাকেশ ঘুরিয়ে দিল কথার মুখ।]

পিনাকেশ: আমি তোদের মতো ওসব ভাবতে পারি না; অথচ আমার কী করা উচিত? এমনিভাবে, এমনিভাবেই রোজ দ্বিজেন কিংবা সিদ্ধার্থ কিংবা সুবীরকে হয়তো জিগ্‌গেসা করবো, 'কেমন আছিস'। অথচ আমার অসুখ বলতেও পারবো না। আমি কি গম্ভীর হ'য়ে যাচ্ছি? ধুস্ শালা এখানটা দমবন্ধ লাগছে। চল এস্‌প্লানডে মেয়ে দেখি কিংবা কোনো সাউথ ইণ্ডিয়ান ফিল্ম।

আমরা এসপ্লানেডে। সরগরম শব্দ আর তরুণী তন্বীবিপুলার ঝাঁঝ নিতে নিতে আমার পেচ্ছাপ পেল। আমরা তিনজনই গড়ের মাঠে প্রস্রাব সেরে ঘুরে চললাম সন্ধ্যা উত্তীর্ণ আউট্রাম জেটিতে। মাঠের-লগে আমরা যেন তিন ভিখিরি শুয়ে। গরম মাস। সিগারেটের ধোঁয়ার উপরে নিঝ্‌ঝুম তিনজোড়া চোখ ওলটপালট হ'য়ে যাচ্ছিলো। যুবক বয়স আর অসংখ্য গণিকার দৃশ্যময় প্রকাশ্য ব্যবসায়িক চিত্রের উপর হামলে নামছিলো তিলোত্তমা ক্যালকাটা।

আমাদের কথা নেমে আসছিলো নিচুগ্রামে। আর সে, যার অনুপস্থিতি কিংবা উপস্থিতি বিষয়ে বিচলিত ছিল না মম হৃদয়ঘটিত ব্যাপার স্যাপার, ফ্যালফ্যাল ক'রে চাইতে চাইতে ভয়ংকর বোকার মতো সরাচ্ছিলো স্তূপীকৃত ধুলো পাথরকুচি। জঞ্জাল কোলকাতা কর্পোরেশনের অস্তিত্ব, রাজনৈতিক যুদ্ধ আর খাদ্যের খনি। অবশ্য এ নিয়ে ৩৬৫ × ১০০ দিনেও মানুষের হাতের চামড়া ফাটে নি কিংবা মেট্রোপলিটান সংস্কৃতির পোকা দাঁতে যন্ত্রণাতাড়ন ট্যাবলেটের সুবন্দোবস্ত ও যোগানে কোনোরূপ অবহেলা দৃশ্য হয় নি। সুতরাং ধ'রে নেওয়া যেতে পারে তিনজন যুবকই সুস্থ। শুধু আমাকে দেখছিলো সে। দস্তুরমতো পিছন নাছোড় বলতে হবে। সে দেখছিলো জীবন-লাগোয়া মানুষের মুখ, যার ফ্যাকাশে চামড়ার উপর চোখগুলো অসহ্য উজ্জ্বল। আমার মধ্যে এসব দেখতে

যেত ব'লেই পিনাকেশ কিংবা আণবিকা সিদ্ধার্থ-স্ববীর কিংবা শম্পা-বাবলিদের যে কারো সঙ্গে-রত অবস্থাতেই দড়াম ক'রে আমাকে অগোছালো হতচ্ছাড়া ক'রে দেয় সে। সে অতএব তার স্বভাবজনিত কর্মকুশলে বেহায়া রকমের ভাস্বর।

আমার ভাল্লাগে না। তাকে ছাড়াতে চায় আমার সহনসীমা। আমি তাকে ছাড়িয়ে নেহাৎই জীবনচরিতে যাবো চ'লে, তারপর হবো বিবেচক সুখী; এইসব খুঁটে নেবার বাসনা-চরিতার্থতা চাবো যার কাছে তার পরিচয়ের আদিতে কি জানি না, জানা হয় নি।

এইসব নিত্য নৈমিত্তিক কসরৎ যুদ্ধের শেষে আগাপাস্তালা খোলনলচে সমেত সে, কোনো চাবুকের প্রহরী না হ'য়েও, দণ্ডমুণ্ড কর্তা-ব্যক্তি কিংবা-ব্যক্তিনির দম্ভ-ব্যতিরেকে নিয়ত দাঁড়ায়। সে—এক যন্ত্রণাময় উপস্থিতি, দংশদগ্ধান অনুপস্থিতি। আমি বলি—'সরো, স'রে যাও'। দুম্ ক'রে দরোজার ভিড় ঠেলে সে, সে-ই।

আমার দিন চলে। তা'তে-আমায় যুদ্ধ আরো শাণিত হয়।

নাস্তিকতার দর্শন

[VLADIMER DEDIJER ও JEAN PAUL SARTRE'র কথোপকথন। Heresy : Ancient and Modern লেখার অনুবাদ]

অনুবাদ ও বিশ্লেষণ : **পথিক বসু**

দেদিজার— ...এই মুহূর্তে যদি আপনি এ শহরের মানুষকে ভিয়েতনাম যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের মনোভাব জানার চেষ্টা করেন তাহলে দেখবেন সকলেই ভিয়েতনামের পক্ষে রায় দিচ্ছে, কারণ এদের হাড়ে মজ্জায় জড়িয়ে আছে এক ঘৃণা, ভয়— যার নাম মৃত্যু; এরাও তো কম সয়নি। এ হোলো মানবিক নিষ্ঠার এক দিক। অন্যদিক দিয়ে দেখি আমাদের যুদ্ধ অপরাধ সংক্রান্ত বিচার সভার মূল্য কতোটা যথার্থ। এ ব্যাপারে আপনার কি মত?

সার্ত্র— সত্যি কথা বলতে কি প্রথম মহাযুদ্ধের খুন খারাপি একটু ছন্নছাড়া গোছেরই হয়েছিলো। যুদ্ধের সর্বপ্রথম কাজ হোলো সামরিক শক্তিকে গুঁড়ো করা, যা অর্থনীতিকে অবশেষে ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু যেখানে নাগরিকদের সাথে সৈন্যের কোনো তফাৎ থাকে না সেখানে একটা বিশেষ জায়গা ধ্বংস করা কিংবা একটা বিশেষ অংশকে গুঁড়িয়ে দিলেই জয় হবে সেটা অসম্ভব ব্যাপার হ'য়ে পড়ে। সর্বোপরি বিবাদমান দেশগুলো যুদ্ধের সাথে সাথে কড়া নজর রাখে তাদের অর্থনীতির ভিটামিন তথা ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর। দুটোর মধ্যে একটা সাম্যাবস্থা তারা রাখতে চাইবেই। যার ফলে অত্যাধিক লোকক্ষয় তাদের ধাতে সয় না, অতএব জবাই-যজ্ঞের মাঝপথে তারা বালি ছেটাতে থাকে, হঠাৎই শান্তি ও সভ্যতা তাদের আপ্লুত করতে থাকে। এমনটিই ঘটতো। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে ঔপনিবেশিক লড়াইয়ের ঢঙ পাল্টে গেল। লড়াইয়ের প্রকৃতি আগেভাগে ছক ক'রে ফেলা হয়— একদিকে শক্তিধর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক পরাধীন মানুষ...গোটা হত্যাকাণ্ডের ছককে তখন অগেরিলীয় পদ্ধতিতে সাজান হয়। ঠিক যা ঘটেছে ভিয়েতনাম যুদ্ধে ..।

একই সাথে আমরা দ্বিবিধ কার্যকলাপ লক্ষ্য করি— সামরিক শক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদ নিজে, দুজনেই ভয়াল শক্তি নিয়ে হত্যালীলা সাঙ্গ করতে থাকে,

প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে কোনোই ফারাক রাখেনা অথবা যারা প্রতিরোধ কিংবা মুক্তি-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করছে তাদের মুছে দিতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এমতাবস্থায় একটা প্রশমনহীন হত্যাযজ্ঞের মুখোমুখি হই আমরা। ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বও এ সময় বিকশিত হ'য়ে পড়ে— ধ্বংস না করলে চলবেনা আবার সীমাহীন ধ্বংস সহজেই মুছে নেয় সাম্রাজ্যবাদীদের শিকার সেইসব উৎপাদক মানুষগুলোকে যারা এতদিন কম মজুরীতে অতিরিক্ত শোষণ মেনে সাম্রাজ্যবাদকেই বিকশিত করার কাজে নেমে পড়েছিলো। কিন্তু ভিয়েতনাম যুদ্ধের মূল চালিকা শক্তি ছিল সামরিক বাহিনী (অর্থনৈতিক ব্যাপার তো ছিলই তবে পরোক্ষে)। ওদের মতলব ছিল কমিউনিষ্ট চীনকে ঘিরে ধরা। ব্যস, তাতেই ঐ অঞ্চল জুড়ে প্রবাহিত হোতো ত্রাসের তরঙ্গ, জনসাধারণের মুক্তির চেহারাতে ঢালা হোতো ভয়ের মিক্ গ্যাস। নয়তো কি? এমনিতেই ভিয়েতনামকে কলোনী বানাবার ইচ্ছে আমেরিকার আদৌ ছিল না। কার্যক্ষেত্রে ভিয়েতনামের জনসাধারণের লড়াকু চেহারা ওদের মতলবকে আটকে দেয়, ফলে এই ভয়ঙ্কর তাণ্ডব যার মুখোমুখি আজ আমরা, এখনো। আবারো বলছি শান্তির দিন যদিও আসে— তা হবে আমেরিকার আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির জন্য এবং ভিয়েতনামীদের শক্তির জন্য— ওরা ভয় পাবে এবং সাম্রাজ্যবাদ বনাম ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্ব যে মুহূর্তে ফুটে উঠবে তখন ওরা চাইবে শান্তি। অন্যথায় ওদের চোখে শুধুই ধ্বংসের আগুন…।

দেদিজার— এই বিচারসভা সম্পর্কিত সমালোচনাকে আমি হাজারবার ভেবে দেখেছি, ভেবে দেখেছি আমাদের সম্বন্ধে আমাদের সমালোচনাকে, কিভাবে আমাদের বিচারসভাকে আন্তর্জাতিক আইনসভাতে রূপায়িত করা যায় তাও ভেবেছি, জানা হয়নি আপনার মতামত। এ ব্যাপারে…।

সার্ত্র— আমার সাদামাটা বক্তব্য হোলো আমাদের লোকেরা বোঝে কম। যেমন ধরুন গুন্টার গ্রাস (Gunter grass)— উনি মনে করেন আমরা নাকি এমনি বিকট বুদ্ধিমান যাতে আমরাই শুধুমাত্র বিচারক হবার যোগ্য। ওর লেখাকে আমি যতোটা সম্মান করি, ওর বুদ্ধিবৃত্তিগত দেউলেপনাকে ততোটাই স্বীকার করি। যে মুহূর্তে আমরা আমাদের উন্নততর মানুষ ব'লে ভাবতে শুরু করবো সেই মুহূর্ত থেকে আমাদের বিচার করার অধিকার চ'লে যাওয়া উচিত। অন্যদিকে এটাই ভাবা উচিত যে আমরা সাধারণ মানুষেরই মতো এবং তাদেরই প্রতিনিধি হ'য়ে সবার স্বার্থেই একটা বিচারসভা গড়তে চাইছি। সত্যি বলতে কি, এই বিচারসভা, এজন্যেই নাস্তিক যেহেতু আমরা আরেকটা ইনস্টিটিউশন

খুলতে নারাজ। এটা প্রয়োজনবোধে জন্ম নেবে, কাজ ফুরোলে ফুরিয়ে যাবে। ধরুন আরেকটি ইনস্টিটিউশন হোলো। লাভ কি? ন্যুরেনবার্গ বিচারসভা তো এক নামকরা ইনস্টিটিউশন; একসময় এর প্রয়োজন ছিল, বলাও হয়েছিলো যাবতীয় যুদ্ধের বিরুদ্ধে এ এক জেহাদ, তো আজ?…হয় না, আন্তর্জাতিক পরিবেশই একে অচল করে দেয়। আজ আমরা বিচারক। কেন? না, যেহেতু রাসেল সর্বসম্মতি-ক্রমেই আমাদের ডেকেছিলেন। ভবিষ্যতে যদি জনসাধারণ মনে করেন যে সেই পরিস্থিতিতেও আমরা বিচারক হবার উপযুক্ত—অবশ্যই আমরা থাকবো। অর্থাৎ আমাদেরও বিচার করার বিচারক দরকার, এ জন্যেই আমি ইনস্টিটিউশন বিরোধী এক নাস্তিক সংগঠনের কথা বলছি যাতে কখনোই মনে হবে না যে আমরাই একমাত্র বুদ্ধিমান ইত্যাদি ইত্যাদি গোল গোল সব কথা।

দেদিজার: বিচারসভার মৃত্যু, তাহলে…

সার্ত্র: অবশ্যই। ধরা যাক এই-যে আরেকটি বিচারসভা এলো, আরো কিছু মানুষ তো গড়লো। সেই দেশের ব্যাপারে তারা হয়তো যথেষ্টই জারিত। কিন্তু সেখানে আমরা আলাদা কেন? এ কারণেই আমরা ইনস্টিটিউশন বিরোধী। আর ঐ প্রচলিত আইন কানুন? 'রাধিব, বাড়িব, ভোজন করিব, হাঁড়ি তো ছুঁইব না'। হিটলার পতনের পর তারা আইন দেখিয়ে বলে হিটলার বড্ডো জানোয়ার হয়ে যাচ্ছিলো। তারা সবসময়ই নিজেদের বাঁচাতে ব্যস্ত এবং কোনো-সময়ই তারা চায়না যে আইন সেই ঘৃণ্য ব্যক্তিটির ঘাড়ে পড়ুক, যাতে তাদেরও প্রাণে টান পড়তে পারে। অন্যদিকে আমরা কি করবো? ঐ আইনকে চ্যালেঞ্জ করবো, ঘৃণ্য অপরাধী আমেরিকার দিকেই তার মুখ রাখবো। এটাই মনে হয় কাজ। নয়তো আমাদের আন্তর্জাতিক বিচারসভায় পাঠালে তা বুর্জোয়ার দালালিই হবে, আর কিছু হবেনা।

দেদিজার: আমাদের বিচারসভা গড়ার প্রথম দিকে দ্য গলের মন্তব্য কি আপনার মনে আছে?

সার্ত্র: অবশ্যই। ওনার মূল কথা ছিল এই ট্রিবুনাল নির্বিষ এবং এর সার্ব-ভৌমত্ব যে কোনো রাষ্ট্রের মতো—বেশী কিছু নয়। একটু অন্য কোণে দেখুন—যে কোনো রাষ্ট্র একটি প্রতিষ্ঠান, আর সেই রাষ্ট্র কর্তৃক স্থাপিত একটা বিচারসভা প্রতিষ্ঠান হতেই বাধ্য, জনসাধারণের কোনো ভূমিকাই যে নেই। বিপরীতে আমরা চাইছি জনসাধারণের সংযোগে গড়ে উঠুক আমাদের বিচারসভা। আমাদের বলতে হয়নি, আমরা নিজ উদ্যোগেই দেখিয়ে দিলাম আমাদের সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের

জগাখিচুড়ি সার্বভৌমত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী—ঐ ঘোমটাটানা গণতান্ত্রিকতা যে অগণতান্ত্রিক—তাও দেখিয়ে দিলাম। কি, দেখাইনি ?

দেদিজার : থাক এ হোলো আলোচনার এক ধাপ। পরের ধাপে আসি। ছাত্র আন্দোলন সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা মনে রেখেই জানতে চাইছি আপনার আজকের ভাবনা কি ?

সার্ত্র : যুবকদের অনুসৃত হবার ঝোঁকটা আজকাল খুব বেশী হ'য়ে যাচ্ছে। আপনি তো জানতেন আমাদের পরিকল্পনাটা। ভেবেছিলাম সব দেশের বিপ্লবী ছাত্রদের এক জায়গায় এনে আলোচনা চালিয়ে দেখবো তারা একমত হয় কিনা। এখন এ সম্বন্ধে আরো পরিষ্কার হয়েছি আমার মতো বুড়োমানুষের পক্ষে ও সব ছেলে ছোকরাদের ভাবভালোবাসা ঘটানোর চাইতে ওদের যুদ্ধে পাঠানো ঢের ভালো। ঐ আলোচনাচক্র নিতান্তই এ্যাকাডেমিক হোতো ব'লে আমার ধারণা। সবাই একমত হোক কিংবা একপথে কাজ করুক—এ আমরা চাই। আর সেটি সম্ভব কেবলমাত্র লড়াইয়ের মাঠে, চেয়ার টেবিল পেতে একের পর এক পালা করে বক্তিমে চালিয়ে নয়। আটষট্টির মে'র ফ্রান্সে যুবছাত্রবিদ্রোহ আমাকে এ সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করেছে। ওখানে দেখলাম লড়াইয়ের সময় সবাই এক, আবার লড়াইয়ের শেষে ওরা পৃথক! আমার মনে হয়েছে লড়াইয়ের আঁচেই শুধুমাত্র একতা সম্ভব।

আমি বিশ্বাস করি যে এই সব যুবছাত্রেরা নিছক আমোদ কিংবা খাম-খেয়ালীত্ব এড়াতে বিদ্রোহী হয়নি, এরা একটা নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের স্বপ্ন দেখে ব'লেই বিপ্লবী হয়েছে। এখন এই বিপ্লবীয়ানাকে কিভাবে বাড়িয়ে তোলা যায় ? আমাদের দেশগুলোতে, যেখানে একচেটিয়া পুঁজিবাদের একনায়কত্ব, সেখানে একটা বিশেষ দ্বন্দ্ব আপনি লক্ষ করে থাকবেন, যেটি হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজিবাদ তার শোষণকে মোলায়েম রাখতেই বাধ্য হয় শ্রমিকের জীবন ধারণের মান উন্নত করতে, শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে এবং এই ব্যবস্থাগুলি তার পরিপন্থী সত্বেও। শিক্ষা বাড়ানো মানেই ছাত্রের সংখ্যাবৃদ্ধি, আবার সেইসব ছাত্রের পাঠশেষে কর্মসংস্থানের সুযোগ পুঁজিবাদ দিতে অপারগ—দ্বন্দ্বটা জমে ওঠে। ছাত্ররা দেখে শিক্ষা ততোটাই তাদের, যতোটায় ডেকে আনা হয়েছে, বাকী অধিকার ইনষ্টিটিউশানদেরই হাতে। এতে ছাত্ররা শ্রেণীচ্যুত হয়, রাজনীতি শিখতে বাধ্য হ'য়ে পড়ে। ইনষ্টিটিউশন বলবে—তুমি লেখাপড়া করতে পারো। আবার ইনষ্টিটিউশন বলবে—দরকার নেই ভাই, ফিরে চলো। অর্থাৎ আমার অধিকার নেই, থাকলেও খুব নগণ্য। ছাত্ররা

বস্তুর মতো—ইচ্ছেমতো তাদের বসানো হচ্ছেনা, ইচ্ছেমতো তাদের পছন্দ করা হচ্ছে, পছন্দসই ছাত্রকে বিশেষ এক হাঁসজারু শিক্ষা গেলানো হচ্ছে। এই শিক্ষা প্রযুক্তি বিদ্যাগত হ'লেই বুর্জোয়াদের শুভ হয়। যাতে এসব ছাত্রেরা সরাসরি কারখানার আধকাঁচা ম্যানেজমেন্টে যোগ্য হ'য়ে যায়; অর্থাৎ তারা হ'য়ে যায় বাছাই করার যন্ত্রে কিংবা দাম চালানো যন্ত্র। সচেতন ছাত্রেরা এখানেই ধন্দে পড়ে। এপথে চললে তারা শিক্ষার বস্তু ভিন্ন কিছু নয়; অন্যদিকে শিক্ষাকে জনমুখী যদি হতেই হয় সে তার গতি বজায় রাখতে চায়। অতএব ছাত্রদের পক্ষে এর বিরোধীতা করাটাই কাম্য হ'য়ে পড়ে।

দেদিজার : আমাদের থিসিসে আমরা তথাকথিত ওয়েলফেয়ার স্টেটের (welfare state) সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমার দেশের মানুষেরা মনে করে যে ওয়েলফেয়ার স্টেটগুলোর যাবতীয় সমস্যা, যাবতীয় দ্বন্দ্ব অবৈরীমূলক (non-antagonistic) এবং এদের বিবর্তনজনিত (evolution) তত্ত্ব দিয়েই সমাধান করা যায়। কিন্তু কি দেখছি ? ফ্রান্স তো মুখে বলে যে তারা ওয়েলফেয়ার স্টেট, তারা কি কোনো সমস্যাই অবৈরীমূলক ভাবে মেটাতে পারছে ? এটাই বাস্তব যে মৌলিক সমস্যা মেটাবার একমাত্র পথ হোলো বিপ্লবের পথ, বৈপ্লবিক কর্মধারার পথ। তা এটির সাথে ছাত্রসমস্যাকে কিভাবে মেশানো যাবে ব'লে আপনার মনে হয় ?

সার্ত্র : ঐ নিয়েই কথা বলতে যাচ্ছিলাম; একটা ঘটনা নিলে দ্বন্দ্বের বৈরী চরিত্র ফুটে উঠবে। এই যে তথাকথিত ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্রেরা গাদা গাদা ছাত্র বানাচ্ছে, আবার তাদের যথাযোগ্য স্থানে বসাতে পারছে না—সেখানে কি পুলটিশ লাগিয়ে সমাধান খোঁজা হবে ? বিবর্তনের তত্ত্ব আউড়ে ? প্রশ্নটাই সমস্যার চরিত্রকে যথাযথ ফুটিয়ে তুলছে।

দেদিজার : আমি প্রশ্নটা এ জন্যেই করছি যে আজকের দিনে ফ্রান্সের মতো ছাত্র-যুববিদ্রোহ আবারো ঘটতে পারে, তা দানা বাঁধতেও পারে। আমাদের থিসিসটি যদি সত্যি হ'য়ে থাকে তাহলে বলতেই হয় যে সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন না ঘটানো অব্দি এ জাতীয় অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে…

সার্ত্র : অবশ্যই…

দেদিজার : তাহলে সিদ্ধান্তে আসছিই যে সামাজিক সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করতে পারি, দেখতে পারি বিদ্রোহের আগুন অন্য কোথাও জলে উঠছে…

সার্ত্র: ফ্রান্সে যদি না হয়, অন্য কোথাও হবেই, কারণ অবস্থা পাল্টায়নি।

□

সার্ত্র: এবং ছাত্ররা যদি বিপ্লবী চেতনায় দীক্ষিত না হয়, যদি না তারা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে নিজেদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে—যা শিখছে তাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। ইনস্টিটিউশনের রীতিনীতিকে বিরোধীতা করতে না পারে—অর্থাৎ সব দিক দিয়ে যদি প্রশ্ন করার উপলব্ধি তার না আসে—তাহলে বিপ্লব সংক্রান্ত সিরিয়াস প্রশ্ন বৃথা। তাদের কাছে এসব মেলে আসলে পড়ে থাকে একটিই কথা—বিপ্লব। সমস্যা তখন থাকে একটাই—কাদের সঙ্গে ক'রে? অবশ্যই শ্রমজীবি মানুষের ঐক্য সেই পথ। আশা করি বোঝাতে পারলাম যে আধুনিক পুঁজিবাদের কোনো বিশেষ দ্বন্দ্বতে চোখ রেখে এইদিক দেখাতে সক্ষম হয়েছি। এতো একটা দিক মাত্র। আর আপনি নিশ্চয়ই মানবেন যে আমার চেয়ে মার্কস আরো স্পষ্ট বলেছিলেন যে দ্বন্দ্বই ইতিহাসের চালিকা শক্তি। তাহলে কি আমরা এবার পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব থেকে চোখ সরিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বে চ'লে আসতে পারি না? সমাজতন্ত্রও তো একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া? তো সমাজতন্ত্র বলতে আপনার কি মনে হয়েছে?

দেদিজার: এ' শুধুমাত্র শোষণ এবং উৎপাদিকা শক্তির বিকাশই নয়, ঐ ব্যবস্থা মানবিকতার বিকাশ এবং মানবিক সুসম্পর্কও বটে। এবং এ কারণেই মানুষ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চায়।

সার্ত্র: এক মিনিট? এই কি সব সমাজতান্ত্রিক দেশের 'সমাজতন্ত্র' ব'লে আপনার মনে হয়েছে?

দেদিজার: এটা ঐতিহাসিক সত্য যে মানবিক সমাজতন্ত্র প্রত্যেক সমাজতান্ত্রিক সমাজের সংবিধানে (constitution) স্পষ্টভাবে লেখা আছে। কিন্তু কথা ও কাজের ক্রমবর্ধমান ফারাক, আমরা দেখছি তাতার সমস্যা নিয়ে রুশদেশে হত্যাকাণ্ড, যুগোশ্লাভে শ্রমিক বিদ্রোহ, '৫৩, '৫৪, ৫৬'র পূর্ব ইউরোপে বিক্ষোভ, প্রায় সব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ছাত্র বিক্ষোভ। দেখছি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক অর্থনৈতিক অবরোধ (রাশিয়া কর্তৃক চীনকে অবরোধ), ধ্বংস করার ইচ্ছা, কখনো আবার চেক দেশে সরাসরি ঢুকে পড়া। সবচেয়ে বেদনাদায়ক ব্যাপার হোলো—যুদ্ধ, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ। অথচ মার্কসবাদ শিখিয়েছে যে আজকের যুদ্ধের এক ইতিহাস আছে। এটি মানুষের অপরিবর্তনীয় চরিত্রের ফসল নয়। বলতে পারি যুদ্ধ এসেছে তখন থেকেই যবে থেকে সমাজে

শ্রেণী বিভাজন শুরু হয়েছিলো, এক শ্রেণী কর্তৃক আরেকশ্রেণী শোষণ। মার্কসবাদ বলেছে যুদ্ধ ধনতন্ত্রের একচেটিয়া, সাম্রাজ্যবাদীদের একমাত্র অঙ্গ এবং মার্কসবাদ বিশ্বাস করিয়েছে, যে সমাজে শ্রেণীর লোপ ঘটলে যুদ্ধ লোপ পেতে বাধ্য। অথচ বাস্তবে দেখছি সমাজতান্ত্রিক দেশের ঘরে বাইরে যুদ্ধ প্ররোচনা। তাহলে নতুনরা কি দেখবে, কি শিখবে? আর এটাই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংক্রান্ত আলোচনার মূল প্রশ্ন হওয়া উচিত— এ শুধুমাত্র বিমূর্ত তাত্ত্বিক কচকচি নয়, নয় ইতিহাস নিয়ে মাপাজোকা, এর প্রয়োজন ভবিষ্যৎ সমাজতন্ত্রের জন্য। আজকে তো দেখছেন কমিউনিস্ট পার্টিগুলো হরদম মস্কোয় ব'সে সমস্যার শীতলীকরণ করছে— সমাজতন্ত্রের বিকাশে নাকি তেমন কোনো তীব্র দ্বন্দ্ব নেই। এ যে স্টালিনবাদের পুনরাবির্ভাব! পঞ্চাশ বাহান্নর দিকে স্টালিন লিখেছিলেন যে সমাজতন্ত্রের সব সমস্যাকে সমাধা করা যায় ক্রমিক পদ্ধতিতে (gradualism) এবং বিবর্তমানতার (evolution) রীতিনীতিতে এবং পরিমাণ থেকে গুণে রূপান্তরণ প্রক্রিয়া কেবলমাত্র অসমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামোয় বিদ্যমান। অথচ দেখুন সেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বারবার গণবিদ্রোহের রোষ ⋯⋯।

রাশিয়াতে এ জাতীয় সমস্যার একটা উত্তর দেয়া হয় ব্যক্তিবাদ (personality cult) —কি বলব, এক ধরণের আধ্যাত্মবাদ (subjectivism) অথবা নয়া বাস্তবধর্মিতা (neo-pragmatism), যাকে প্লেখানভ বলতেন আত্মবাদী ভাববাদ (subjective idealism) এ থেকে কি বুঝি? বুঝি এই যে ওরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যে কোনো সমস্যাকে অর্থনৈতিক বা সামাজিক পটভূমিতে দেখতে নারাজ। অন্যদিকে আমার মনে হয় সমস্যার শুরু বোধহয় ঐ দিক থেকেই। ওদের বাস্তব জমি (base) যদি শক্তপোক্ত থাকতো তাহলে কি এমনটি ঘটা সম্ভব হোতো? হোতোনা। আমি মনে করি যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষের সামাজিক অস্তিত্বের সাথে সামাজিক চেতনার সম্পর্ককে ফিরে দেখা উচিত, ব্যাপারটাকে অর্থনীতির সাথে উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। আর সেই মৌলিক সমস্যা তো আছেই—সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উদ্বৃত্ত মূল্য কিভাবে বণ্টন করা হচ্ছে? হয়তো বলতে পারেন এই মূল্যায়নে আমরা স্টালিন-জামানার আলোচনা প্রথমে রাখতে পারি, দেখতে হবে শুধুমাত্র অর্থনীতি দিয়েই নয়; সামাজিক, মনোদর্শন, শিল্প ও তার মূল্যের সমস্যা, প্রত্যেকটি সামাজিক, মনোজাগতিক দিককে যথেষ্ট মূল্য দিয়েই এ কাজ করতে হবে— একটা জায়গা থেকে স'রে গেলে পুরো ব্যাপারটা যান্ত্রিক হ'য়ে যাবে— জমি আর উপরিকাঠামোর সম্বন্ধ হ'য়ে যাবে ধ্রুব কিছু।

এক জন ইতিহাসবেত্তা হিসেবে আমি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব নিয়ে একটা স্কীম করেছি সেটা হচ্ছে :—

[ক] ভূমিকা—

দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন মার্কসবাদী অথবা কমিউনিস্ট গ্রুপের মধ্যে যে জাতীয় তাত্ত্বিক আলোচনা হয়, তাদের বিবেচনা করা ; মূল্যের নিয়ম সংক্রান্ত তাত্ত্বিক সমস্যাকে খতিয়ে দেখা।

[খ] পণ্যসঞ্চালনের পুঙ্খানুপুঙ্খ—

উদ্বৃত্ত মূল্য কিভাবে বণ্টন করা হয় ? বিশদে—

(১) রাষ্ট্রের মধ্যে বণ্টন, উৎপাদক গোষ্ঠীর মধ্যে বণ্টন। এই উদ্বৃত্ত মূল্যের বণ্টনে উৎপাদকদের সক্রিয় ভূমিকা কি ? গোটা কাঠামোটি কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ? কিভাবে মজুরী নির্ধারণ করা হচ্ছে ?

(২) রাষ্ট্র, পার্টি, সামরিক শক্তি, পুলিশ, ট্রেড ইউনিয়ন, টেকনোক্রাট গোষ্ঠী ইত্যাদি ক্ষমতাকে কি প্রক্রিয়ায় চালানো হচ্ছে ?

(৩) উৎপাদন ও বণ্টনের চক্র (কেন্দ্রীভবন, বাজার)

(৪) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে উন্নত এবং অনুন্নত অঞ্চলে কিভাবে উদ্বৃত্ত মূল্যের ভাগ-বাটোয়ারা হয় ? বিভিন্ন রাজ্য কিভাবে তা উপভোগ করে ?

(৫) শ্রমবিভাজন এবং শ্রমিকের কর্মদক্ষতার ফারাক মেনে তাদের মধ্যে উদ্বৃত্ত মূল্যের বণ্টন, বিশেষতঃ

(অ) হস্তচালিত এবং বুদ্ধিবৃত্তিজনিত কাজে

(আ) দক্ষ ও অদক্ষ কাজে

(ই) শহর এবং গ্রামকেন্দ্রিক কাজে

(৬) নারী ও পুরুষের মধ্যে উদ্বৃত্ত মূল্যের কিরকম বিভাজন ?

(৭) ঐ একই ; প্রজন্মগত ভাবে (প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে, যুবকদের মধ্যে)।

[গ] সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কর্মবিভাজন এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের বণ্টন—

(১) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্পর্কিত তাত্ত্বিক নীতি।

(২) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির উন্নয়নের তুলনামূলক আলোচনা, অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত ও অনুন্নত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দূরত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা।

(৩) স্টালিনীয় সময় ও তার পরের সোভিয়েত দেশ, পূর্ব ইউরোপ (রপ্তানি-বাণিজ্য বিষয়ে শোষণের নগ্নরূপ, 'মিত্রসমাজ', 'সহায়তা' ইত্যাদির পদ্ধতি ও নীতি)

(৪) রাশিয়া এবং চীন— কোনপথে ?

(৫) পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের (কিউবা, ভিয়েতনাম, উঃ কোরিয়া) মধ্যকার সম্পর্ক।

[ঘ] সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং অনুন্নত দেশগুলির মধ্যকার সম্পর্ক (তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গে এবং তৃতীয় বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সহায়তা ও বাণিজ্য ইত্যাদি)।

[ঙ] সমাজতান্ত্রিক দেশের সাথে বিশ্বের পুঁজিবাদী বাজারের সম্পর্ক—

(১) উৎপাদন কাঠামোয় প্রভাব

(২) পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পুঁজির থাকে মিশ্র উদ্যোগের চেহারা

(৩) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপর পুঁজিবাদী ঋণের প্রভাব

আমার মার্কসীয় চেতনা অনুযায়ী আমি মনে করি যে সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিবর্তনের মৌলিক শর্ত হোলো উৎপাদিকা শক্তি বনাম উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্ব। সেখানে সর্বাপেক্ষা জটিল অধ্যায় হোলো উদ্বৃত্ত মূল্যের বণ্টন। একথা অবশ্যই স্বীকার করি যে সমাজতন্ত্র ইতিমধ্যেই পুঁজিবাদকে হটিয়ে দিতে পেরেছে। কিন্তু নিরবিচ্ছিন্ন বিপ্লব যদি না থাকে ? উৎপাদন শক্তি বনাম উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্বের যদি যথার্থ একটা দিক না থাকে, তাহলে ?

সার্ত্র : এ আমারো কথা। একটা ধারাবাহিকতা থাকতেই হবে। ইনস্টিটিউশান তৈরী হবে, তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তৈরী করতে হবে উন্নততর আরেক ইনস্টিটিউশান— থামলে চলবে কেন ? আর থামলেই সমাজতন্ত্রে পড়বে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী (State capitalism) আস্তরণ। আপনার কথাটাই ঘুরিয়ে বলি— ইনস্টিটিউশনের অন্তর্ভুক্ত জনগণকে প্রশ্ন করতেই হবে— নেতৃত্বে যারা থাকে তারা যে ইনস্টিটিউশানে থাকাকালীন জনগণের নিয়ন্ত্রণে থাকে না বা চলে না…।

সার্ত্র ও দেদিজারের আলোচনা এখানেই শেষ (বারট্রাণ্ড রাসেলের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে রাসেল পীস ফাউণ্ডেশন কমিটি (Russel Peace Foundation Committee) 'সমাজতান্ত্রিক মানবতা'র উপর এক আলোচনার আয়োজন করেন—তাতে এই কথোপকথনটি সংকলিত হয়েছিলো। উনসত্তর সালে যুগোশ্লাভ শহরে সার্ত্র এবং দেদিজার এই কথোপকথনটি রেকর্ড করিয়েছিলেন। মূলত: এটি একটি সিনেমার অংশ (যার লেখক ছিলেন দেদিজারই)—এখানে দেখি পৌরাণিক নাস্তিকতা থেকে শুরু ক'রে আজকের প্রতিরোধ আন্দোলনের ধারাবাহিকতা নিয়ে ওঁদের আলোচনা। দেখি ছাত্র আন্দোলন নিয়ে ওঁদের ভাবনা চিন্তা। যুদ্ধ ও রাসেলের যুদ্ধ অপরাধ সংক্রান্ত বিচারসভার (war crimes tribunal) সার্থকতা (যাতে ওঁরা দুজনেই সদস্য ছিলেন) নিয়ে কথাবার্তা। সর্বোপরি দেখি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসম্বন্ধে ওঁদের ধ্যানধারণা।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—কেন এ লেখার অনুবাদ ? অবশ্যই এক প্রয়োজন অনুভব করে। কি সেই প্রয়োজন ?

বাম রাজনীতির সচেতন চিন্তাশীল ব্যক্তিরা একটা কথা নিশ্চয়ই মানবেন যে কমিউনিস্ট ঐক্য আজ মৃত। কবে থেকে ? কেউ বলবেন—কমিণ্টার্ণ তুলে দেবার সময় থেকে। কেউ বলবেন—রুশ-চীন বিরোধ থেকে। প্রশ্নটা কিন্তু গুলিয়েই ওঠে। কেন কমিণ্টার্ণ তুলে দেয়া ? কেনই বা রুশ-চীন বিরোধ ? আরো পেছিয়ে আসতে হয়। দেখা যায় রুশী পুঁজিবাদ (সমাজতন্ত্রের ঘোমটা মেনে) চব্বিশ সাল থেকেই জন্ম নিয়ে ফেলেছে। এই পুঁজিবাদই [কেউ কেউ বলেন সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ] এহেন অনৈক্যের দিকে পরিচালিত করছে রাষ্ট্রকে। অতএব কমিউনিস্ট ঐক্যে ভাঙন।

অন্তরের প্রবাহন রাজা তবু দালভ্য মুনিদের কোণঠাসা করতে থাকে। কেনই বা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ? বিশেষ ক'রে যখন কিনা বিপ্লবের ঝাঁঝ তীব্র।

এর উত্তর আর পাওয়া যায় না। হয়ত কেউ জানেন বা ভাবেন, বলতে সাহস পান না। কারণ চব্বিশের আগেকার ভুলভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা মানে লেনিনের কাঁধে হাত পড়া, এঙ্গেলসও বোধহয় বাদ যাবেন না (লুকাচের what

is Orthodox Marxism লেখাটির প্রতি সমর্থন রাখছি)—আর এসব কথা বললেই মার্কসবাদী মহলে পড়বে ত্রাহি ত্রাহি রব, বিপ্লব বিপ্লব খেলা করা যাদের মূলমন্ত্র, তারা সবার আগে মেনে নেয় তারা সত্য, সত্য তাই এঙ্গেলস, লেনিন, স্টালিন ডট্ ডট্ ডট্। অতএব চব্বিশে কেন আটচল্লিশেও এমন কিছু ভুলচুক ধরা পড়ে নি।

যারা মার্কসবাদী রাজনীতি করেন তারা প্রত্যেকেই এই জালে বদ্ধ। আজকের কিছু কিছু নকশাল পন্থী গ্রুপেরা চব্বিশের রাশিয়ার নয়া অর্থনৈতিক নীতি (New Economic Policy)'কে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের বীজ বলে মনে করছেন, কিন্তু তার আগের ছবিকে দেখতে হচ্ছেন নারাজ। কারণটা আগেই লিখেছি। আর এটিকে কেন্দ্র করেই দেখতে পাই সার্ত্র—দেদিজার আলোচনার প্রয়োজনীয়তা।

□

আলোচনার তিনটি স্তর। এক, ভিয়েতনাম যুদ্ধ এবং রাসেল সৃষ্ট বিচার-সভার প্রয়োজন নিয়ে আলোচনা, দুই ছাত্র রাজনীতিকে একটা স্বতঃক্রিয় (autonomic) অধ্যায় হিসেবে আলোচনা, তিন, সমাজতন্ত্রের গতিবিধির আলোচনা। এদের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিন শাখায় নিবদ্ধ হয়ে যাই।

ক) ইনস্টিটিউশান অথবা, সংগঠন অথবা, পার্টি—কি এবং কেমন ; কোথায় এর প্রয়োজনীয়তা, সীমাবদ্ধতাই বা কোথায় ?

খ) ছাত্র রাজনীতির চেয়ে কয়েক কদম জোরালো পার্টি আন্দোলনেও কিভাবে একনায়কত্ব কায়েম করা হয় ? এরই বা কি চরিত্র ?

গ) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র—অর্থনীতিগত ভাবে উদ্বৃত্ত মূল্যের সর্বেসর্বা ভূমিকা কেন ?

ক) ইনস্টিটিউশন-বাদ : গণ আন্দোলন ও যেখানে গণমুক্তির প্রশ্ন জড়িয়ে আছে সেখানে একক থাকার কথা সর্বতোভাবে বৃথাই, দরকার এক সংগঠনের, সমষ্টিগত সমঝোতার—জনসাধারণের স্বার্থে জনসাধারণের ঐকিক সম্পর্কের। এটি অপ্রতিরোধ্য প্রয়োজন এবং এর মাপকাঠিতে পরবর্তী প্রয়োজন হয় নেতৃত্বের। কমিউনিস্ট পার্টিরা অতঃপর দুটি থিসিস রাখে : (ক) পার্টি সদস্য (declassed হওয়া) (খ) গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা (democratic centralisation) : ইতিহাস

দেখাচ্ছে দুটি থিসিসই ভুল—তত্ত্বগত ভাবে এদের অস্বীকার করা যায়না কিন্তু প্রয়োগে এদের আদতেই মানা হয়না। কিভাবে ?

অর্থনৈতিক মুক্তি আন্দোলনে অংশ নেন দু'ধরণের মানুষ—যারা সরাসরি যুক্ত, অভাবগ্রস্ত, শৃঙ্খল ছাড়া যাদের হারাবার কিছু নেই ; দুই, যারা অনুভূতির পথ বেয়ে আসেন (যথা মার্কস, লেনিন)। এখন দুজনেই বদলে যেতে পারেন (না পারাটা যদিও চাই)—প্রথম জন কিছুটা স্বস্তি পেয়ে পাল্টে যেতে পারেন, দ্বিতীয়জন অনুভবের সুর বদলে গেলে পাল্টে যেতে পারেন। এটা হয়েছেও। যে কারণে বিপ্লবের আগে পরে মানুষের চরিত্রের মূলগত পরিবর্তন ধরা পড়েছে বহুবার। তার মানে মানুষের মানসিক মাপকাঠি অর্থনৈতিক বেড়াজাল মেনেও অনেকদূর যেতে পারে। এখানে সমস্যা এবং সম্ভাবনা হোলো—সামাজিকীকরণ, ব্যক্তি থেকে সামাজিক হবার প্রবণতা। খেতে পাই না, খেতে হবে— ঐ এক কথা ; আবার খেতে পাই না ; খেতে এবং খাওয়াতে হবে— এ আরেক কথা। দুটো কথা মনের দুরকম সত্তার বহিঃপ্রকাশ— প্রথমটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক, দ্বিতীয়টি সামাজিক মানবতাবাদী। এবং এই সামাজিকীকরণের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় বহিরুদ্দীপক চেয়েও অন্তর্জ্বলনের তীব্রতা বেশী দামী।

এটি কি মানা হয় ? পার্টির সদস্য হ'লেও কি সে কমিউনিস্ট মানসিকতায় দ্রবীভূত হ'য়ে যায় ? এতই যদি সহজ হোতো তাহলে স্টালিন কেন স্টালিন কর্তা হবার দিকে ঝুঁকলেন, ইগোকে দমন করতে পারেননি বলেই তো ? তাহলে পার্টি সদস্য হবার সার্থকতা কোথায় ? পার্টির মধ্যে কর্তৃত্ব কায়েম করায় ?

একই কারণে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার শ্লোগান ব্যর্থ হয়ে যায়। কর্তা যখন কর্তৃত্বই চালান তখন নির্বাচনে অ্যাড-হক ভিত্তিটাই সত্য হতে বাধ্য হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন উঠতে পারে মানুষ মেনে নেয় কেন ? মানুষ কেন লেনিনের পরে স্টালিনকে মেনে নিয়েছিলো ? বা ক্রুশ্চেভ ব্রেজনেভকে ? কেনই বা মাও-এর পর দেঙ-নেতৃত্বে প্রসারমান হয় ? উত্তরে বলবো, মানুষের চরিত্রে একটি ধ্রুব দিক আছে যা হচ্ছে তার অসহায়তা। অতীতে এর থেকেই জন্ম নিয়েছিলো ঈশ্বর, বর্তমানে জন্ম নিচ্ছে প্রশ্নহীন আনুগত্য। একদিকে যখন সামান্য কিছু মানুষ কর্তৃত্বের ভারে বেসামাল, অন্যদিকে তখন বিরাট এক সংখ্যা নেতৃ-মুখাপেক্ষী,— নেতা যা বলবে তাই ঠিক। অর্থাৎ, দ্বিধাহীন এক ব্যুরোক্রাসীর জন্ম। আর সংগঠন মানেই এই কাঠামো। যেমন সংগঠন না হ'লে সামাজিক সমস্যার সমাধান অসম্ভব, অন্যদিকে সংগঠন বা, ইনস্টিটিউশান হওয়া মানেই ব্যুরোক্রাসী। সার্ত্র

যখন বলছেন, ইনস্টিটিউশানকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে ; তখন সার্ত্র নিজের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলেন। চ্যালেঞ্জ জানাবে কে ? জনসাধারণ ? জনসাধারণের ঐ নির্ভরশীল মানসিকতার সুযোগ নিয়ে কি ইনস্টিটিউশনিস্টরা তাদের মগজ-ধোলাইয়ের সুবন্দোবস্ত ক'রে রাখে নি ? সার্ত্র এদিকটা খেয়াল করেননি আবার একটু আগেই বলেছিলেন প্রতিক্রিয়াশীলরা ছাত্রদের পকেটে পোরবার জন্যে কারিগরী প্রযুক্তিগত বিদ্যা শেখবারই চেষ্টা করে। এখানেই স্পষ্ট হ'য়ে যায় ইনস্টিটিউশানদের মগজ ধোলাই করার দুর্বুদ্ধি—যন্ত্রবিদ্যার মধ্যে ছাত্রদের ফেলে দিলে ক্রমান্বয়ে উৎপাদন, বণ্টন ও বিচ্ছিন্নতায় ছাত্ররা ঐক্য হারাবে, মানবতা বোধ হারাবে, এদিকটা ভেবেই কিনা তারা অমন শিক্ষানীতি চালু করে।

তাহলে সমাধান ? মনে সামজিক হবার নিরলস সংগ্রাম—রবিঠাকুরের কথায়—প্রেমটি যেদিন জ্বালি হৃদয় গগনে ··।

খ) পার্টি একনায়কত্ব : 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী'তে অরবিন্দ কোম্পানীকে তছনছ করতে চেয়ে শিবরাম চক্রবর্তী মহাশয় লিখেছিলেন—সংঘ মানেই সাংঘাতিক। কথাটি সাংঘাতিক নিঃসন্দেহে। তাহলে কি কেউ সংঘ করবে না, তাহলে কার কথা কে শুনবে ? বুঝবেই বা কে ?

সংঘের স্ববিরোধীতা, আগের অধ্যায়ে লেখা আছে। এর সীমাবদ্ধতা জেনেই সার্ত্রর বক্তব্য হয়—সংগঠন গড়া, পরমুহূর্তে তাকে ভেঙে ফেলা ও নতুনের জন্ম দেওয়া। পথ যখন চলার তখন থামা মানেই গতি হ্রাস ; অমনি সংঘ হয়ে যাবে সাংঘাতিক।

যে একনায়কত্ব এড়াতে এই ব্যবস্থা, সেটি কিভাবে দানা বেঁধে ওঠে তা দেখা যাক্। সার্ত্র বলেন, ছাত্ররা লড়াইয়ের সময় এক, লড়াই শেষে পৃথক। শুধু কি তারা ? রাজনৈতিক যে কোনো সংগ্রামে এর ব্যতিক্রম দেখিনা। এবং তখনি দরকার হ'য়ে পড়ে একনায়কত্বের, জন্ম নেয় ব্যক্তিবাদ। আমরা দেখেছি রুশ বিপ্লবের পর ট্রট্স্কীকে নির্মূল করার সুন্দরতম প্রচেষ্টা, ধীরে ধীরে বলশেভিক-বাদকে একনায়কত্বের আসনে প্রতিষ্ঠা করা—না ক'রে যে উপায় নেই ; কর্তৃত্ব বজায় রাখতে হ'লে এ ছাড়া যে গতি নেই। পার্টি নেতা যেমন ক্ষমতা লিপ্সায় এটি করেন, পার্টি ক্যাডাররা সেই পরমুখাপেক্ষী মনোভাবে এটিতে (না বুঝেই হয়তো) সায় দিয়ে বসেন। ছাত্রদের মানসিকতা একটু আলাদা, আবেগ নিয়েই ছাত্ররা রাজনীতি করেন এবং যাকে ভালবাসেন তাকে এতই ভালবাসেন যে তাঁর সম্বন্ধে অন্য একটি দলের বিরূপ মনোভাবে তারা ক্ষিপ্ত হ'য়ে নিজেদের সমঝোতার

পাততাড়ি গুটোতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েন। আমাদের ভারতবর্ষীয় রাজনীতিতেও দেখি প্রো-চারু অ্যান্টি-লিন পিয়াও প্রো-লিনপিয়াও অ্যান্টি-চারু ভাবের নানারকম গোষ্ঠী। সেই একই কারণ। শ্রদ্ধা থাকা ভালো, চোখ বুজে শ্রদ্ধা করা কি ভালো?

লেনিন বলেছিলেন প্রলেতারীয় একনায়কত্ব (Proletarian dictatorship) হবে সমাজতন্ত্রের শাসন—কাঠামো; এখানে সংখ্যাগুরু শাসন করবে সংখ্যালঘুর উপর, অর্থাৎ সর্বহারা কর্তৃক বুর্জোয়াদের শাসনব্যবস্থাই হবে সমাজতন্ত্র। রুশ ইতিহাসই এর বিরুদ্ধাচারণ করেছে—ঘুষ নেয়া, ব্যুরোক্রাটিক শোষণ, সবই এখন খোলাখুলি। লেনিন ভুল করেছিলেন দুদিক দিয়ে, প্রথমতঃ, সংগঠনের মধ্যেকার 'সাংঘাতিক' দ্বন্দ্বটি বুঝতে পারেন নি। দ্বিতীয়তঃ, তিনি নিজেকে দিয়ে বিচার করতে গিয়েছিলেন (এ ভুলটি সকলেই ক'রে থাকেন)। তাঁর সততা ও মানবিকতা দিয়ে গড়া নেতৃত্ব আমাদের যে জায়গায় পেঁছে দেবে—সেটা কি ধ্রুবক? তিনি কি চিরকাল বেঁচে থাকবেন? আরেকজন যে নেতা আসবে; সে কি ঐ একই রকমের সৎ, মানবিক, পূর্ণ হবে? সে যদি তাই হোতো তাহলে এ কথা বলতাম না; কিন্তু সে যদি না হয়? এটা ভাবেননি লেনিন, নির্দ্বিধায় আমরা বলতে পারি যে সংগঠনের একনায়কত্ব ও অগণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার মূলে রয়েছে মানুষের ব্যক্তিত্বের দুটি কু-দিক—

এক, অসহায়তা, দুই, অসহায়তা থেকে উত্তরণ জনিত কর্তৃত্ব পরায়ণতা। যারা সচেতন তারা কি একে অস্বীকার করবেন? এত জেনেও?

(গ) সমাজতন্ত্র ও উদ্‌বৃত্ত মূল্য: আলোচনার শেষধাপ রাষ্ট্রের অর্থনীতি নিয়ে দেদিজারের ধারণা। সার্ত্র যেখানে পার্টি কেন্দ্রিক প্রশ্ন তুলেছেন, দেদিজার সেখানে সমাজকাঠামোর সমস্যাটিকে তুলে ধরেছেন। তুল্যমূল্য উভয়েই সম্পর্কিত। ইতিহাসে আমাদের সম্পর্ক শুরু করার আগে থেকেই কিন্তু আমি-নিরপেক্ষ একটা সম্পর্ক শুরু হ'য়ে গেছে। জেনে বুঝে আমরা এটিকে বদলাতে পারি। জোর পড়ছে তাই জানা, বোঝা ও কর্মের (Praxis) মিলমিশে। এই সচেতনতা থেকে একজন স'রে এলেই (সেই নির্ভরশীল মানসিকতায়) বিচ্ছিন্নতা জন্ম নেয়। অতএব আমরা (আমি) কতটা সচেতন—ঐ যেমন এক প্রশ্ন, আমাদের সচেতন কর্ম কি—সেও তাই সমসাময়িক পরিপূরক প্রশ্ন। এই দ্বিতীয়তে অগ্রসর হয়েছেন দেদিজার।

দেদিজারের কথা অনুযায়ী বুঝতে পারি যুদ্ধ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের

শোষণব্যবস্থার এক চূড়ান্ত ফল, কারণ অবশ্যই অর্থনীতিতে পরিব্যাপ্ত। তাই দেদিজার চলে আসেন অর্থনৈতিক পরিসরে, সাজান এক অসাধারণ ছক। জানি না এই ছকমাত্রিক আলোচনা কতদূর এগিয়েছে, তবে বিশেষ একটি কারণে বুঝতে পারি এটি মূল্যবান। কারণ কি?

উদ্‌বৃত্ত মূল্যের কথা এসেছে হঠাৎ করেই, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উদ্‌বৃত্তমূল্যের বণ্টনজনিত সমস্যাকে মূল ব'লে ধ'রে নিয়েছেন দেদিজার—হঠাৎ ক'রে এলেও বুঝতে কি পারি না যে ওনার চিন্তায় এটি ধাপে ধাপেই এসেছিলো, এরও একটা ইতিহাস আছে?

এর সম্ভাব্য তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে পারি। মার্কসীয় অর্থনীতিতে উদ্‌বৃত্ত মূল্য এসেছে পুঁজিবাদী শোষণের বাড়বাড়ন্তকে বিশ্লেষণ ক'রে যার আবিষ্কর্তা শ্রদ্ধেয় মার্কসই। মার্কসীয় অর্থনীতি অনুযায়ী শ্রমিকের শ্রমশক্তি চুরি করেই পুঁজিপতির বিকাশ—এই চুরি নানাভাবে হতে পারে, প্রযুক্তিবিজ্ঞানের অগ্রগতি এই চুরিকে তীব্রভাবে ত্বরান্বিত ক'রে থাকে—এটিও সত্য। এবং বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা এই চুরিকে চাপা দেবার জন্যে যে শব্দটা আমদানী ক'রে বসেন তা হচ্ছে শ্রম—শ্রমশক্তি নয়। অন্যদিকে মার্কস বিশ্লেষণ ক'রে দেখান যে শ্রমিক শ্রম বেচে না, সে বেচে (অথবা ভাড়া দেয়) শ্রমশক্তি নামের নিজস্ব পণ্যটি এবং শ্রমশক্তির একটি বিশেষ গুণ আছে (যা আর কোনো পণ্যের নেই) তা হোলো এটি মূল্য-সঞ্চারী (Value increasing) শক্তি। অর্থাৎ শ্রমশক্তি তার পুনরুৎপাদনের জন্য ব্যয়িত মূল্য ছাড়া আরো অতিরিক্ত মূল্য উৎপন্ন ক'রে থাকে যাকে বলে উদ্‌বৃত্ত মূল্য। মার্কসের মতে এই উদ্‌বৃত্ত মূল্যকে প্রযুক্তিগত বিকাশের সাহায্যে বাড়িয়ে পুঁজিপতিরা শ্রমিককে শোষণ ক'রে থাকে এবং তাদের অর্থনৈতিক বাড়বাড়ন্তের এটাই হোলো চাবিকাঠি।

এই তত্ত্বকেই কয়েক পা এগিয়ে নিয়ে আসি। শ্রমশক্তির বিশেষ গুণ যদি মূল্যসঞ্চারী শক্তি হয় তাহলে কি পুঁজিবাদি সমাজ, কি সমাজতান্ত্রিক সমাজ—সব সমাজেই এটি সমভাবে মূল্য সৃষ্টি করবে। পুঁজিবাদী সমাজে যদি রাষ্ট্রের সাহায্যেই কিছু সংখ্যালঘু মানুষ এটিকে ব্যক্তিগত মুনাফাতে কেন্দ্রীভূত করে তাহলে সমাজতান্ত্রিক সমাজে কি একই ভাবে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের জন্ম হবে না? শ্রমশক্তিকে কাজে লাগাতেই হবে এবং শ্রমশক্তি কাজে লাগাবার অর্থই হোলো উদ্‌বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি—এই উদ্‌বৃত্ত মূল্যকে ভোগ করবে কে? সমাজতন্ত্রিক সমাজ রাষ্ট্রের দিকে আঙুল দেখায়—তাহলে কি রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের জন্ম হওয়াটা বিচিত্র

(যাকে সার্ত্র বলেন—থামলেই সমাজতন্ত্রে পড়বে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী আস্তরণ) বা অসম্ভব ? এটি অসম্ভব হোতো যদি গতি বজায় থাকতো অর্থাৎ নিরবিচ্ছিন্ন বিপ্লবের ধারা থাকতো অব্যাহত—সারা বিশ্বকে সমাজতান্ত্রিক করার প্রচেষ্টা যদি চলতো, কারণ এই গতিই মানুষকে নিয়ে যেতে পারে কমিউনিজমের দিকে—যেখানে 'যতোটা পারো নাও, যতোটা পারো দাও' নীতিতে সবাই সমান সামাজিক হতে চাইতো। কিন্তু তা তো নেই। বিপ্লব যে মৃত। রুশী সমাজতান্ত্রিক দেশটি বিপ্লবকে শিকেয় তুলে রেখে ফ্যাসিবাদ বিরোধী বিজয় উৎসব পালন করছে বছর বছর। এই স্থিতিতে উদ্বৃত্ত মূল্য রাষ্ট্রকে কি দেবে ? লেনিনের কমিউনিজম নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রের বিলোপসাধনের প্রক্রিয়া যখন মৃত, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের জন্ম হওয়া কি তাহলে অবাস্তব ?

প্রয়োগের দিকে দেখতে পাই রুশ অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের প্রসার ঘটেছে ব'লে বহু খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ দাবী করছেন। তার মানে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদেরই ভদ্রস্থ নাম সমাজতন্ত্র। এই যদি সত্য তাহলে এর কারণ হিসেবে কি শ্রমশক্তির মূল্যসঞ্চারী ভূমিকাকে খাটো করবো যদি অচেতন ভাবেই ধরি শ্রমশক্তিকে প্রয়োগ করার ফলেই কি রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে নিমজ্জিত হতে পারে না একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ ?

আবার বলি মার্কসকে চ্যালেঞ্জ জানাবার জন্যে এ লেখা নয়। মার্কস যা ক'রে গিয়েছিলেন তারও যে পর আছে, তাতেই যে সব শেষ নয় সেটা মার্কসোত্তর কোনো মার্কসবাদীরাই বুঝে উঠতে পারেননি, বুঝতে পারেন নি ব'লেই ভেবেছেন, শ্রমশক্তিকে শোষণ ক'রে পুঁজিবাদী সমাজ। আর সমাজতান্ত্রিক সমাজে যেহেতু সবাই সমান অতএব শোষণ হওয়াটাই অসম্ভব। বুঝতে পারলেন না যে শ্রমশক্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে শোষিত হবার ধরণ।

দ্বিতীয়তঃ বিচ্ছিন্নতা নিয়ে কথা। ধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় জোর জবরদস্তি ক'রে তুলনামূলক (relative) পরিসংখ্যান কষে দেখালেন যে রুশদেশে বিচ্ছিন্নতাবোধ নেই (দ্রষ্টব্য— বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ)। সত্যিই কি তাই ? পাভলভীয় দাসত্বের জালে কি রুশীরা আবদ্ধ নন ? বরিস পাস্তেরনাক কিংবা ইলিয়া এরেনবুর্গের লেখালেখি পড়লেই এর সত্য মিথ্যা ধরা প'ড়ে যায়। আজ সকলেই জানেন যে রুশদেশ চলে তাসবংশের নিয়ম মেনে। [এর মানে এই নয় যে তথাকথিত free world হিসেবে আমেরিকা মানবসমাজের বসবাস-উপযোগী। যাকে আদর্শ ব'লে মানতে চাই তাকে কখনোই অন্য কারোর তুলনা

দিয়ে ভালো বা মন্দ বলাটা খাটে না, তাকে অথবা তার বিচ্যুতিকে তার মূল আদর্শটির তুলনায় বিচার করাটাই সঙ্গত। সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনায় কখনোই আমরা পুঁজিবাদী দেশের সাথে তুলনা করতে পারি না, আমরা জানিই সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমরা বিচার করবো কাঙ্ক্ষিত সমাজতন্ত্রের তুলনায় বাস্তব সমাজতন্ত্র কতোটা এগিয়ে অথবা পিছিয়ে আছে]—এখানে প্রশ্ন করা রীতিমত অপরাধ। তাহলে কি বিচ্ছিন্নতার কথা এখানে অবাস্তব ?

এবার দেখি তাত্ত্বিকভাবেই এর জন্ম নিয়ে বিশ্লেষণ। ধীরেন বাবুরা মার্কস প'ড়ে বড়জোর ভেবেছেন যে মার্কসীয় বিশ্লেষণ পুঁজিবাদী সমাজের নগ্ন বিচার—পুঁজিবাদী সমাজের ভুলত্রুটি তো ধরা প'ড়েই গেছে, এবার একটা ধাক্কা দাও, ব্যস। সমাজতন্ত্র এসে যাবে। জানায়ে দিল যে সে এসেছিল কিন্তু...

আসে নাই

অথচ দেখুন মার্কস কতো সহজে বিচ্ছিন্নতাকে ব্যাখ্যা করেছেন। পুঁজির প্রথম খণ্ডে মার্কস বলছেন—'শ্রমিকের শ্রম প্রকৃতপক্ষে যখনই শুরু হচ্ছে তখন থেকেই সে শ্রম আর তার হাতে থাকছে না। কাজেই তা আর সে বেচতে পারে না। কারণ শ্রমিক আগে থেকেই মজুরী নামক দায়ে ঠেকে গিয়ে তার শ্রমশক্তিটাকে দিয়েছে এবং তার প্রতি শ্রমিকের কোনো কর্তৃত্বই নেই। মালিক যেভাবে তাকে খাটাবে শ্রমশক্তি অন্যান্য পণ্যের মত সেভাবেই খেটে যাবে। এই যে শ্রমিক ও তারই শ্রমশক্তির মধ্যে নিদারুণ বিচ্ছিন্নতা, এর ফলে শ্রমিক তার সচেতনতা হারিয়ে ফেলে। উৎপাদনের গতিবিধিকে সে আর নজর করতে চায় না। ফলে, একটা তীব্র বিচ্ছিন্নতাবোধ তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। এটা ঘ'টে চলে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সব সমাজে।'

এখানেই থেমেছেন মার্কস। কিন্তু ঘটনা কি এখানেই থেমে যাবে ? মার্কস হয়তো কল্পনা করতে চাইতেন যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে যেহেতু শ্রমিকের একনায়কত্ব, অতএব শ্রমশক্তি পণ্য হলেও তাকে পণ্যের মতো শ্রমিকের উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ ভাবে ব্যবহার করা হবে না। কিন্তু তা কি হয়েছে ? যেখানে একনায়কত্ব মানে স্টালিনীয় কর্তৃত্ব সেখানে জনসাধারণের ইচ্ছা বুঝে কিনা রাষ্ট্র চলবে ? ডস্টেয়ভস্কির নির্বাসন ! তাহলে কি সত্য বার হ'য়ে আসে ? এ সমাজেও শ্রমশক্তিকে পণ্যের মতো ব্যবহার করা হয়, শ্রমিক ও শ্রমশক্তির বিচ্ছিন্নতাকে রাষ্ট্রের সপক্ষে নেওয়া হয়— ফলে, একদিকে যেমন উদ্বৃত্ত মূল্যকে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে রূপান্তর করা, অন্যদিকে তেমন বিচ্ছিন্নতাকে জাগ্রত রাখা। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ এ জাতীয়

সমাজতান্ত্রিক সমস্যাকে ছন্দোবদ্ধ ক'রে রাখে— এখানে শ্রমিকেরা শ্রমবিমুখ হ'য়ে যায়— রাষ্ট্রই সত্য এবং নেতৃত্বের কর্তৃত্ব অপ্রতিরোধ্য হ'য়ে পড়ে ; যে দুটি বিষয় রাষ্ট্রের একনায়কত্বের পক্ষে হয় শুভ।

বিশ্লেষণের পর্ব এখানেই শেষ। মার্কস ছাড়িয়ে আরো অনেক সমস্যা এসেছে যাদের সমাধান করা মার্কসের পক্ষে সম্ভব ছিল না ; যেহেতু মার্কসের সময়ে তাদের জন্ম হয় নি। সেইসব সমস্যাকে উদ্ভট মার্কসবাদী খোপে ফেলে আজকের মার্কসবাদীরা আসলে বেঁধে ফেললেন মার্কসসৃষ্ট মতবাদকেই ; চলা ছিল যার ধর্ম, তার এলো স্থিতি। অন্যদিক দিয়ে বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে গেল প্রতিক্রিয়াশীলেরা। আঠেরোশো আটচল্লিশে যারা কমিউনিজমের ভূত দেখতো আজ তারা যথাযোগ্য ওঝা বানিয়ে ফেলেছে। প্রতিপ্রিয়াশীলরা তো কমিউনিজমের চিহ্নিত শত্রু, এই মার্কসবাদীরাও কি তাই নন ?

যাপনচিত্র

অভিজিৎ লাহিড়ী

এখন কেবল একটি ট্যাক্সি থেকে আর একটি ট্যাক্সিতে অবিশ্রান্ত ছুটে যাচ্ছে
আমাদের জীবন, উগ্র পেট্রোল ভেপারে উথলে উঠছে বমি। কান্না শুকিয়ে
মিশে যাচ্ছে দুপুরের ধুলোয়, থুতু আর কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী মার্কা দুরন্ত
ট্রাফিকের দিকে আমাদের লজ্জাহীন মুখ প্রসারিত, অদ্ভুত কায়দায়
আমরা হাত নাড়ছি— দেখা হবে, ফের দেখা হবে... আর ক্রমাগত
একটি ট্যাক্সি থেকে অন্য ট্যাক্সিতে পার হোচ্ছি ভয়ংকর ব্রিজ,

সন্ধ্যায়, আমাদের একান্ত সন্ধ্যায় ভুতুড়ে বাড়িতে থালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে
আমাদের বোন ; প্রেমের সুবিখ্যাত সংলাপ তাকে মুগ্ধ কোরেছে।
তার নীল শাড়ি
উড়ে যাচ্ছে আকাশের দিকে—ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে চিবুকের কঠিন দোপাটি
তবু কান পেতে আছি তার দিকে, স্বপ্ন দেখছি—তার বিয়ে হোচ্ছে
অসংখ্য ট্যাক্সি থেকে নেমে আসছে আমাদেরই মতো মানুষেরা,
ভালোবাসা নিয়ে আনুগত্য নিয়ে—কদাকার মুখে তাদের ফুটে উঠছে
স্বর্গীয় হাসি—

আমরা দূর থেকে এইসব দেখছি—দেখছি জানলার ছোট্ট আকাশে
অসংখ্য নক্ষত্রে ভেসে যাচ্ছে চিরকালীন বাতাস। আমাদের ঘামে ভেজা
নোংরা শার্ট
উড়ে যাচ্ছে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে আর
সমস্ত দিনের শেষে, আমরা শান্ত হোয়েছি, জীবনের বিস্ময় আবার
আমাদের উৎসবের দিকে টান দিচ্ছে—আর আমরা শূন্যতা ভেঙ্গে
শিশুদের কাছে ক্ষমা চাইতে যাবো বোলে প্রস্তুত হোচ্ছি...

জাগরণ

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

পেশির সংঘাতে জেগে উঠেছিলো পিরামিড,
সংঘর্ষে জেগে উঠবে ভারতবর্ষ।

মানুষের অবধারিত কর্মফল জমা হচ্ছে চতুর্দিকে,
সমস্ত নদী গান দিয়ে ভ'রে দেয় মহাসমুদ্র,
সব পাখি জাগিয়ে তোলে সুপ্রভাত,
সমস্ত বাতাস দক্ষিণ দিক উজাড় ক'রে
নিয়ে আসে বসন্ত।

আমরা মাঘের শেষে ঘর বেঁধেছি গাছতলায়,
সারারাত মাথার উপর ঝ'রে পড়বে আমের মুকুল,
বাতাসে শুনতে পাবো পরস্পরের কণ্ঠস্বর,
ফাল্গুন ও চৈত্রে ক্রমশ গরম হবে দক্ষিণের বাতাস,
সমস্ত কোকিল স্তব্ধ হ'য়ে গেলে
আমরা ফিরে যাবো গ্রামে গ্রামান্তরে।

ফসল কাটা হ'য়ে গেলে মাঠ আর্তনাদ করে,
সেই শস্য মজুত হয় দু একটা অমানুষের ঘরে,
বণ্টনে ও বঞ্চনায় ভারি হ'য়ে ওঠে গাঁয়ের কুয়াশা,
বৈশাখের বিকেলে শোনা যায় বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ,
সেই বিদ্যুতে আলো হয়ে উঠবে আমাদের হাত
পেশিতে খেলা করবে ঢেউ-খেলানো হিমালয়—
পেশির মহাসংঘাতে জেগে উঠবে সারা পৃথিবী।

বারোমাস্যা

অভিজিৎ ঘোষ

প্রতিদিন উঠে একই মুখ দেখা
এক
দুই হাঁটু ভাঙা দুইহাতে কাদা
দুই
তিনজনা মিলে ত্রিভুবন খায়
তিন
এক দুই তিন
তিন দুই এক
চার
বাকী চারজনা চতুর্ভুজের চারদিক
জোগায় খাদ্য দেখে পাঁচশালা
পাঁচ
পাঁচ-ভাতারের একটিই বউ বারোমাস
ছয় ঋতু জুড়ে হয় প্রজনন যন্ত্র॥

ভিন দেশী

জ্যোৎস্নাময় ঘোষ

সূর্য এখন এপারের আকাশে, পশ্চিমশায়ী। চারধারে গোধূলির এক ব্যাপ্ত বিষণ্নতা। ওপারের মাঠ-প্রান্তরে, ছোপ ছোপ ঘন নীলের গাছ— গাছালির মাথায় মাথায়, ইতিউতি ছড়ানো ছিটনো দোচালার জমাট তরঙ্গে যাই-যাই-রোদের রেশটুকু লেগে রয়েছে তখনও। ইষ্টিকুটুম পাখিটা পিত্‌রাজ গাছের মগডালে দোল খাচ্ছে এখনও। ওর সঙ্গিনী এক-ডাল-তফাৎ থেকে নিশ্চুপে তাকিয়ে আছে ওর দিকে এক মগ্ন বিষাদে।

দুদু মিয়া জানে, দূরের ঐ রুঠা জমিটার পৈথানে দাঁড়িয়ে থাকা ডালপালাহীন জিগে গাছের মাথা থেকে রোদ স'রে যেতেই পাখিটা উড়াল দেবে। মেয়ে পাখিটাও ওর সঙ্গে সঙ্গে খানিক দূর যাবে, আবার ফিরে আসবে একসময়, হয়তো এই পিত্‌রাজ গাছেই কিংবা অন্য কোথাও। কিন্তু ভোর হতে-না-হতেই ওপারের রোদ গায়ে মেখে ঠিক এই গাছটাতেই এসে বসবে ওই ইষ্টি পাখি, ডাকবে,কুটুম। আর পলক ফেলতে-না-ফেলতেই তার কুটুম যথারীতি ডানা মেলে তার পাশটিতে। ক মাস ধ'রে এই একই দৃশ্য সকাল-সন্ধেয় দেখে আসছেন দুদু মিয়া। কেন যে এরা ঘর বাঁধে না—

'চাচা!'—গগন ডাকলো খুব নরম গলায়, খুব সন্তর্পণে। কেমন যেন অনুতপ্ত মনে হোলো তাকে।

যেন এই ডাকটারই অপেক্ষা করছিলেন তিনি। লাঠির মতো মুহূর্তেই সেটিকে যেন তুলে নিলেন দুদু মিয়া এবং গগনকে বানাতে শুরু করলেন 'ইতে চিঁড়ে ভিজবে নানে, গগনচান! সব শালোকে চেনা হয়ে গেচে আমার, বুয়েচ? খাঁটি ছৈদের বেটা আমি, এ্যা, আর আমারে চোপা শোনাও! জানো, এই বনগাঁ থে' মক্কা তক যত ছৈদ এন্তেকাশ ফরমেচেন, তোমার কতা শুনে তেনারা সব গোরের মদ্দি পাশমোড়া দিয়েচেন—জানো? তেমন দিন থাকলি তোমার মত অমন দশ বিশডা পাতি হেঁদুকে এক কতায়-ইয়ে-হ্যাঁ, মুখো ঘাস বানায়ে থুতাম। এহন 'চাচা', অঃ!'

দুদু মিয়ার এই তিরস্কার এবং উত্তাপ, যেন প্রাপ্য ব'লেই, ঘাড় গুঁজে নীরবে গ্রহণ করলো গগন এবং আরো কিছু পাওনা আছে ধ'রে নিয়েই যেন উবু হয়ে ব'সে রইলো তেমনিই।

আড় চোখে বারকয়েক তাকে দেখেশুনে যেন প্রীত হলেন দুদু মিয়া, তা তার কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠলো না অবশ্য। বাঁ হাতের মুঠোয় খপ্ ক'রে দাড়ির গোছ চেপে ধ'রে গর্জে উঠলেন তিনি, 'আমার চোহির সামনে থে' চ'লে যাও তুমি।— কই?— বুড়ো বসে মার খাতি চাও?'

গগন ওঠে, জরিপ করার মত ক'রে দুদু মিয়াকে দেখে। তার চাচার মুখ তখন অন্য দিকে ফেরানো। একসময় ফিক ক'রে হেসে ফেলে সে। তারপর অবিকল এক সরীসৃপের মতো পাশের ঝুপড়িতে ঢুকে যায়। ঝুপড়ির ভেতরে অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে তখন। বিড়ির ডালাখানা পাশে নামিয়ে রেখে হেসে কুটোপুটি হচ্ছে ফুলি। ঝাঁপের পাশ ঘেঁষে থপ ক'রে ব'সে পড়ে গগন, কুটিল চোখে তাকিয়ে থাকে ফুলির দিকে।

বাতাসে দোল-খাওয়া লাউডগার মতো ফুলি যেন দুলতে থাকে। গগন খাটো গলায় ধমকে ওঠে একসময়, 'হেই, হচ্ছেডা কী! নখুনী-কুটুনীর রকম দেক!'

কথাটার সঙ্গে বিড়ি বাঁধার সম্পর্ক। মুখ আর পেছন 'মারার' সময় নখ আর কাঠির ব্যবহার থেকেই কথাটা চালু হয়েছে— 'নখুনী-কুটুনী'। নখ মানে, তর্জনীর নখের ওপর লাগানো লোহার একখানা কৃত্রিম নখ। ফুলিকে আজকাল, কখনও কখনও, নখুনী-কুটুনী ব'লেই ডাকে গগনচাঁদ— রাগ, বিরক্তি কিংবা ঘনিষ্ঠ সব মুহূর্তে।

গগনের ধমক খেয়ে যে ফুলির হাসি তখনই বন্ধ হোলো তা নয়। হাসি কখনও ছেড়ে যায় না তাকে। এ-নিয়ে কিছু বলতে গেলেই শোলোক শুনিয়ে দেয়— 'দুঃখে বাস, সদাই হাস।'— ব'লেই খিলখিল।

ডালাখানা সরিয়ে রেখে গগনের কাছে উঠে এলো সে একসময়, ফিশ্‌ফিশ করে বললো, 'কী হয়েচে গ? চাচা খেপিছে ক্যান?'

কথাটা বলার জন্যই এতক্ষণ যেন হাঁকুপাঁকু করছিলো গগন। বাঁ হাতে শরীরের ভর রেখে ফুলির দিকে ঝুঁকে এলো সে, 'আরে সে-কতাডাই তো কতি চাচ্চি। তা তুই তো হি-হি করেই মরচিস।'

'বল'।— গম্ভীর-গম্ভীর মুখ ক'রে আসনপিঁড়ি হয়ে বসলো সে। চোখে-মুখে হাসির উদ্‌ভাস নিয়ে গগনের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'ই কতা সি কতা হচ্চিল। কোতাও কিচু না, ও মা, ফস করে বলে উটলে, 'জানিস, তদের শিব ঠাউররে আমাদের আলি বেঁদে রেকেচেন কাবায়।' কদিন, ই কতা শুনে কার না পিত্তি জ্বলে! তা ছোট করে যেই না এট্টু বলিচি, "নাই কতাও এত কতি পার"— বাস, আটপহরের কেত্তন বসিয়ে দেলে!'

কুটুম পাখি চলে গেছে অনেকখন। অন্ধকারে ডুবে গেছে সব কিছু। চারধারে বস্তুর রেখান্বিত কংকালের ভেতর ব'সে থাকতে থাকতে নিজেকে এক-সময় বড়ো একা-একা লাগে দুদু মিয়ার। ইদানীং একধরনের ভয় সব সময় যেন পায়ে পায়ে ফেরে তার। বয়সের ধর্মই হয়তো এই, মানুষকে ভয় দেখায় সে। বত্রিশ নাড়ির বাঁধন যখন শিথিল হ'য়ে আসে, আশ্রয় স্থিতির কথাটাই তখন বড় বেশি ক'রে মনে হয়। সাড়ে তিন হাত জমির নিশ্চয়তার জন্য বুকের ভেতর একটা ঘূর্ণি হাওয়া ঘুরে বেড়ায় সব সময়।

এই বিশাল জাহানে দুদু মিয়ার খোদাতাল্লা এক আঙুল জমিও কোথাও লিখে রাখেননি তার জন্য। এই নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বুকের ভেতরটা হিম হয়ে এলো তার। প্রায়ই এ-রকম হয় আজকাল। হয় ব'লেই লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে পায়ে পায়ে করিমের ওখানে চ'লে গিয়েছিলেন একদিন। সাঁয়ত্রিশ বছর আগে সকলের অমতে খুব দম্ভ দেখিয়ে যে-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, পরাজিতের মত সেখানেই আবার ফিরে যেতে হোলো, এ-বেদনা তাকে স্বস্তি দেয়না এখনও। নিজের কাছে নিজেই যেন আর মুখ দেখাতে পারেন না আজকাল।

করিম, তার আপন ছোটো ভাই, প্রথম তো চিনতেই পারলো না। সেটা অবশ্য তার দোষ নয়। বার বছরের যে-কিশোরকে রেখে গিয়েছিলেন, সে এখন এক প্রৌঢ় গৃহস্থ, চারদিকে তার অনেক বিস্তার। বার-উঠোনে বেশ কিছু লোক তাকে ঘিরে নানা আরজিতে মুখর তখন। আম গাছের ছায়ায় একটা কাঠের চেয়ারে ব'সে ঘন ঘন পা নাচাচ্ছিলো করিম, আর পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা মপেডের মসৃণ সীটে হাত বুলোচ্ছিলো। শুনেছিলেন, এখন স্বচক্ষেই দেখলেন, ভাই তার সত্যি-সত্যিই এক মান্যিগণ্যি লোক হয়ে উঠেছে। মাথায় অনেকটা ছাড়িয়ে গিয়েছে তাদের। বাপ-চোদ্দ পুরুষ ধ'রে এর তার জমিতে চাষ ক'রে বেড়িয়েছেন—এক কাঁচি জমিরও মালিক ছিলেন না তারা। জমি-জিরেত যাদের ছিল, কী দাপটই না ছিল তাদের। ভয়, অনিশ্চয়তা, অসম্মানের সেই সেই জীবন ছেড়ে চ'লে যেতে বুকের কোথাও তাই টনটন করেনি দুদু মিয়ার।

ওদিকে যখন দরবার চলছে, এদিকে তিনি তখন চারদিক খতিয়ে খতিয়ে দেখছিলেন।—'করিম কী কোন চেরাগ পেয়েচে না কী—সেই যে, যা ঘষলিই জলজ্যান্ত একখানা জিন এসে আদাব বাজায়। 'জিন, তুমি এহন কার?' না, 'চেরাগ যার'।'

ছেলের দেশ-বাড়িঘর ছেড়ে যাওয়ার কথা শুনে বাপ কেমন যেন 'তব্দা' মেরে রইলেন কদিন। শেষমেষ, অবাধ্য পুত্রকে একদিন ঘুম থেকে ডেকে তুললেন মাঝরাতে। আকাশে তখন অমারাত্রির ব্যাপক অন্ধকার, নিচে হেমন্তের রিক্ত মাঠে জোনাকির জলানেভা। খানিকখন চুপ ক'রে থেকে তিনি বলেছিলেন, 'যেতে চাচ্চ, যাও। ভাল হোক তুমার, সুহে থেক।' তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন, 'তুমার উপর অনেক ভরসা করিচিলাম। বস হয়ে গেচে তো—কবে আচি, কবে নাই।'

'সে কতাই তো বলচি কদিন ধরে—'সকলে মিলেই চল'। কোন মহুডা আচে এহানে, শুনি!'—ঝামটে উঠেছিলেন দুদু মিয়া।

বাপ বোধ হয় মৃদু হেসেছিলেন, ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে দূর অন্ধকারে চোখ ফিরিয়ে বলেছিলেন, 'মদ্দ কনে, বাপ।—তবে কী জানো, ইহানকার দুঃখু জানি, বজ্জাতি জানি, ঠগ-জোচ্চোর-জমিদার মহাজনগে চিনি। কিন্তু উহানকার কিছুই যে চিনিনে, বাপ। চেনা দুঃখু ছেড়ে অচেনা সুহির পথেও পা বাড়াতে যে ভরসা পাইনে।'

'তো চেনা দুঃখু নিয়েই থাক। অনেক হয়েচে। কাল সকালেই চলে যাচ্চি আমি—'

'না।'—করুণ মিনতিতে যেন ভেঙে পড়েছিলেন তার বাপ। দুদু মিয়ার হাতদুটি চেপে ধরেছিলেন তিনি, 'না, আজ রাতেই চলে যাও—এহনই—'

'এহনই।'—হাতদুটি ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন দুদু মিয়া। অন্ধকারে তার জন্মদাতার চোখ দুটি খুঁজে বেড়ালেন আতিপাতি।

'আন্ধারে সব কিছু ঢেকে আছে এহন। তুম্‌মো আমারে পষ্ট করে, দেকতি পাচ্চ না, আম্‌মো তুমারে পষ্ট করে চিনতি পাচ্চি নে। যেতে চাও তো এহনই চলি যাও।'

কথাগুলি স্পষ্ট যেন শুনতে পেলেন দুদু মিয়া। সাঁইত্রিশ বছরের ব্যবধানটি চকিতেই যেন ঘুচে যায়। ঘাস মাটি গোবরের পরিচিত মিশ্র গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। বুকের ভেতরটা কেমন যেন খাঁ-খাঁ, শূন্য মনে হয়।

এক সময় কে যেন ব'লে যায়, 'আপনেরে ডাকতিচে। তাড়াতাড়ি যান। মিয়াছাবের 'কোটে' যাওয়ার সময় হয়ে গেচে।'

'করিম কী 'কোটে' কাজ করে না কী ? উকিল, না, মুহুরী ? তাত্থেই এত সব—এই কোঠাবাড়ি ।—' এগিয়ে যেতে যেতে এইসব ভাবেন ।

চেয়ার ছেড়ে তখন উঠে পড়েছে করিম। প্রকৃতই ব্যস্ত দেখালো তাকে। ভেতর বাড়ির দিকে মুখ ক'রে সে চেঁচাল, 'কে আছিস রে ? আমার ব্যাগটা দিয়ে যা। আর বলে দে, সদরে যাচ্ছি, ফিরতে রাত হতে পারে।'—তারপর মুখ ফিরিয়ে মিষ্টি হেসে বলল, 'মিয়াভাইরে যেন চিনিনে মনে হয়।'

কিছুক্ষণ দোনামোনা ক'রে পরিচয়টা শেষ পর্যন্ত দিয়েই ফেললেন। সবকিছু শুনে কেমন যেন থুম মেরে গেল করিম। মনে মনে বুঁঝি কথাগুলির বিশ্বাস-যোগ্যতা যাচাই করে নেয়। তারপর রসকষহীন গলায় জিগ্গেস করে, 'তা, কী মনে করে ?'

করিমের বিরস কণ্ঠ, তার ভাবলেশহীন মুখ স্পষ্টতই দমিয়ে দেয় দুদু মিয়াকে। তবু, যে-কথাগুলি বলবেন ব'লে মনে মনে সাজিয়ে রেখেছিলেন, অনেকটা মুখস্থের মতো করেই তা ব'লে ফেলেন, 'কী জান, আর থাহা যাচ্চে না। ওপর্থে দেকলি সব ঠিকই আচে। কিন্তু জিনিসপত্রির দাম উঠন্তি লাউডগের মত খালি ওট্চেই, ওট্চেই—ধরে কোন শালোর সাধ্যি ! না খেয়ে মরার গোচ হয়ে পড়িচিল। খালি 'মুছলমান মুছলমান' করলি তো আর প্যাট ভরে না, বল ? তা আল্লার নাম নে বারায়ে পড়লাম। তোমরা দশ জনা যকন রয়েচ—'

করিম ততক্ষণে মপেটে উঠে বসেছে। খুবই নিস্পৃহ চোখে তার দিয়ে চেয়ে বলে, 'অ'— সঙ্গে সঙ্গে পা তুলে নেয়, একটা ঝাঁকানি নিয়ে মুহূর্তেই উধাও হ'য়ে যায়।

নিজেকে এতটা ছোট আর মনে হয়নি কখনও।. বুকের ভেতর থেকে খাবলা দিয়ে কী যেন নিয়ে গেল করিম, জীবনের মতো নিঃস্ব করে রেখে গেল তাকে।

কী করে যে ফিরে এলেন, আজ আর তা মনে পড়ে না। পিত্রাজ গাছটার তলায় বসেছিলেন অনেকখণ জবুথুবু। কিন্তু ফুলির চোখে ধরা পড়ে গেলেন। কিছু একটা ভাঙচুর হয়ে গেছে তার ভেতর, কী ক'রে যেন বোঝে ওই 'এক করে' মেয়েটি। বাজার ফেরত পোয়াতী মেয়েটি হাঁপাচ্ছিলো তখনও, কিন্তু ওপর নজর পড়তেই থলিটা নামিয়ে রেখে ছুটে এসেছিলো এক গলা উৎকণ্ঠা নিয়ে, 'কী হয়েচে গ, জেটা ? শরীল খারাপ ?' তারপর ঝুঁকে প'ড়ে কপাল আর বুকের উত্তাপ নিয়ে বলেছিলো, 'নাঃ, শরীল তো য্যান ভালই মনে হয়।—মন খারাপ ?' সেই মুহূর্তে, সেই কবেকার হারানো একটি সুঘ্রাণ যেন ফিরে পেয়েছিলেন—মা জাবেদার

শরীরের গন্ধ, পুরনো কাঁথা, সোনামুখী সুঁচ, ধান এলে-এলে-দেয়া ছন্দময় দুটি পা—আর, মুহূর্তেই বুকের ভেতরকার চাপ চাপ অনুভূতিটা হালকা হয়ে এসেছিলো; খুব সহজ হয়ে এসেছিলেন। এক গাল হেসে বলেছিলেন, 'এ-কল্জেখান বড় শক্ত রে, বেটি। পাঠানগে হাতে দু-দুটো জুয়ান ছেলে খতম হলো, তাতেও 'টস' খায় নি। এহন তো আমার ভরা সোম্সার, নাতি আসতিছে, এহন আমার দুক্খু কিসির—'

বড় শান্ত নির্জন আর ছায়াচ্ছন্ন জায়গাটা। কাঠের বোঝাখানা ধপ ক'রে নামিয়ে রেখে একটা শিশু গাছের তলায় ব'সে পড়লেন দুদু মিয়া। তার রোমশ বুকখানা ওঠানামা করছিলো তখনও, হাঁ ক'রে ক'রে যেন বা বাতাসই গিলছিলেন। চোখ বুজে গাছটার গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসলেন। দাড়ি বেয়ে টসটস করে ঘাম ঝরতে লাগলো, বৃষ্টির পর বনস্পতির পাতা চুইয়ে যেমন টুপটাপ টুপটাপ—এ-সময় এক বদ্না পানি পেলে বড় ভালো হোতো। হঠাৎই কারবালার কথা মনে পড়ে যায়। কানের ভেতর ভোঁ-ভোঁ করে কী যেন বাজে, চোখের গভীরে, চাপচাপ অন্ধকারে শতেক জোনাক পোকা ঘুরে বেড়ায় যেন।

দুদু মিয়া বোঝেন, বয়স ধ'রে ফেলেছে তাকে, সেই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে বন্দী হয়ে পড়েছেন যেন কখন সবুজ নিশা পরীর খোঁজে হারা-উদ্দেশ সফচান যেমন হাম্বালা দেউনির হাতে বান্ধা পড়েছিলো। তবে এতো জানাই যে, দেয়েরা সাত মাসের জন্য ঘুমিয়ে পড়বে একদিন, কিস্সার রাজপুত্র এ সুযোগে পিঠটান দেবে অনিবার্য। কিন্তু সময়ের হাত থেকে তার কোনো ছাড়ান নেই, তার তীক্ষ্ণ নখর দুদু মিয়ার কাঁধে চেপে বসছে ক্রমশ।

অথচ, এ-সময় এ কোন্ বেপাকে ফেললো তাকে আল্লাহরসুল। গগনচান এতদিন আগলে আগলে রেখেছে তাকে। নিজের ছেলেও হয়তো এতখানি করে না। খানসেনাদের হাতে দু-দুটো ছেলে হারিয়ে নিজের জান নিয়ে কোনরকমে পালাচ্ছিলেন যখন, হিন্দুস্তানমুখো বিশাল জনস্রোতের ভিড়ে গগনের সঙ্গে পরিচয় তার। সেই থেকে এক সঙ্গেই আছেন। একসঙ্গেই এপার ওপার করলেন কতবার। এর মধ্যেই ফুলি এলো। তিন জন হলেন তারা। মেয়েমানুষ হচ্চে গে তোমার নৌকার বাদাম—সোম্সার এগিয়ে যায় তত্তর করে। তা যাচ্চিলও। কিন্তু আবার চলে আসতে হোলো। অভাবী মানুষের য্যান শেকড় বাকড় ছাড়তে নেই কোথাও। থিতু হওয়া নেই। আলগোচে বস, আবার আলগোচে উঠে পড়। কোথাও কিছু ছিঁড়ে যাওয়ার ভাবনা নেই।

কিন্তু ইবার লোভের খপ্পরে প'ড়ে গেল ছেলেডা। এই সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে পাতা রয়েছে লোভের রকমারি সব ফাঁদ। ইপারে বি-এস-এফ, উপারে বি-ডি-আর, আর মধ্যিখানে লোভ লালসার পাকা সড়ক। পাকা বটে, কিন্তু সরকারি না, কাজে কাজেই আইনীও না। 'বডার' ফৌজদের চোখ উলটে, রাইফেল উরদো করে থাকার কথা যদিও, তবু আচানক কী যেন হয়, দুপক্ষেরই বেজায় তম্বিতম্বা তখন। তখন—

নুতন লক লাগে যান ?

প্রশ্নটা শুনেও তখনই চোখ মেললেন না দুদু মিয়া। এক গা অবসাদ নিয়ে বসে রইলেন তেমনি।

কথা কন না যান ?

কণ্ঠস্বরটি বেশ ভারী। মনে হয়, যেন ওজনদার কেউই হবে। কণ্ঠটি চারপাশের নৈঃশব্দ্যে ভেসে রইলো কতক্ষণ।

দুদু মিয়া এবার তাকালেন। খানিকটা দূরে আলো-আঁধারের আলপনার ভেতর দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটি। ভারভাত্তিক মাঝবয়সী মানুষটি তখনও তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। চোখে চোখ পড়তেই দুপা এগিয়ে এল সে। এবার স্পষ্টতই শঙ্কিত হয়ে উঠলেন দুদু মিয়া। কেননা, তিনি জানেন, এরপর কাঠকুটরোগুলো নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। প্রশ্ন ওঠে, মারধোর হয়, কদাচিৎ থানা পুলিশও—জঙ্গলের কাঠকুটো কুড়নো নিয়ে এ-সব এখন প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোকটাকে এগতে দেখেই যেন-বা গা ঝাড়া দিয়েই উঠে পড়লেন।

লোকটা যেন গুনিন, মনের লেখা পড়তে জানে। এক গাল হেসে বললেন, না না, আপনে যা ভাবতেচেন, আমি সে লুক না। কাটঠুকরাও না, পুলিশের লুকও না। আমি থাকি আপনের ওই—

'কাটঠুকরা' ফরেস্ট গার্ডদের চলতি নাম। কথাটা শুনে প্রকৃতই নিশ্চিন্ত বোধ করলেন দুদু মিয়া।

তখনও এক নাগাড়ে বলেই যাচ্ছে লোকটি, দ্যাশ ছিল ডাহা জিলায়। আহা, সে কী দ্যাশ। পুকৈরে মাছ খলবল খলবল করতাচে। গুয়া-মৌরী চাউলের নাম শুনচেন ? কী বাস, হালায় বিশ তিরিশটা গ্রাম যান মাতাইয়া রাখে। আরে, এই সব কথা না হয় বাদই দেন। ওইরকম জাম্বুরা আর খাইলাম না একটাও কী রস, কী দানা এক একখান। কিন্তু চইলা আইতে আইল। পঞ্চাশ সনে সেই যে রাইট আইল আর ভরসা পাইলাম না। কিন্তু দ্যাশের লুক দেখলে ম্যান্তনা আইরলখাঁ এখনও যান পাক যারে বুকের মইধ্যে। মিয়া কী ওই পারের লুক না কী ?

হ। খুব আলগোছে কথাখানা বললেন দুদু মিয়া।

ক্যা, ওই রকম সুনার দ্যাশ ছাইড়া চইলা আইলেন ক্যা ! গলার স্বর মুহূর্তেই পালটে গেল তার। রীতিমত অভিযোগের মত শোনাল কথাটা।

সে সুনার দেশ আর নেই। দীর্ঘনিশ্বাসের ঝাপটায় কথাগুলি করুণ স্বরে বেজে উঠল যেন।

ক্যা, গেল কই !

তা তো কতি পারিনে। চালির সের দশ টাকা, ত্যাল ষাট টাকা মুঠা গুড় বিশ টাকা, একখানা গামছার দাম তিরিশ টাকা। এরে যদি সুনার দেশ কতি চান তো সুনার দেশ। কিন্তু মানুষ বাঁচে সেহানে কী করে। মানুষ তো গাছপাথর না যে তার নড়ন নাই। সে নড়ে, নড়তে নড়তে কোথায় না চলে যায়। সিরাজগঞ্জের এক্রাম আলি খুব ডম্ফ করে বলেছিল, ভিটে ছেড়ে নড়ব না, খোদার কসম। গোরে যাতি হলে এহানেই যাব। —একটু থেমে আক্ষেপ কিংবা আত্ম—ধিক্কারের স্বরে বললেন, সিরাজগঞ্জের এক্রাম নইদে জেলার জলাঙ্গীর পড়ে গোরের মধ্যি শুয়ে আছে এহন। সবই নছিব। দেশ ভাগ হইল, হিঁদু তার দেশ পেল, মুছলমানরাও পেল তার নিজির দেশ। কিন্তু খাওন-পরন ? তা পেল কই ? প্যাট জলে। সে-আগুন তো 'বডার' মানে না। ছুটে ছুটে তাই আসি খেদানও খাই, বাবুরা বলেন, 'তুমরা ভিনদেশী, ঘুরৎ যাও।' চলে যাই। কিন্তু প্যাটও যে সঙ্গে সঙ্গে যায়। নাজ নজ্জার মাথা খেয়ে আবার চলে আসি একদিন।

কেমন যেন থুম মেরে গেল লোকটা। তার ছড়ানো ভরাট মুখ জুড়ে নেমে এল গভীর এক বিষাদ। থপ করে সে বসে পড়ল দুদু মিয়ার কাছাকাছি। তার মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইল। মনে হলো কিছু বুঝি বলবে। কিন্তু চোখ নেমে এল শেষপর্যন্ত তার পায়ের কাছেই।

তারপর এই দুই বয়স্ক মানুষ মাঝখানে কিছু নির্বাক প্রশ্ন রেখে বসে রইল দুটি পাথরের মূর্তির মত।

এদিকে দিনের বয়স বাড়তে লাগল ক্রমশ। গাছগাছালির অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে এল পশ্চিমশিয়রী সব ছায়া। সমগ্র বনভূমিতে নেমে এল ব্যাপক এক নৈশব্দ্য।

জেটা—

তবু তাকাতেই হয়। ফুলির দিকে আজকাল আর তাকাতে পারেন না দুদু মিয়া। বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। এই দেড়—দুমাসেই রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে মেয়েটা। বাধকের রোগে ধরল কী না কে জানে।

হাত বাড়াতেই নিচু হয়ে ছেলেকে ছেড়ে দিল ফুলি, দুদু মিয়া লুফে নিলেন কাঁথার সেই পোঁটলাটি। প্রায় তার গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে রইল ফুলি, ডান পায়ের বুড়ো অঙ্গুলের নখে মাটি কাটতে লাগল।

তা যেন দেখেও দেখেন না দুদু মিয়া। অথবা তার মনোযোগ তখন দু হাতের ফ্রেমে বন্দী ছেলেটির দিকে। তার সঙ্গে তখন তার খলবল আলাপন— হ, বুজেচি, বুজেচি। আর হাসে না নে, মদু। অ আমার সুনার চান গ— জেটা—বলে এক দমে কথাগুলি বলে গেল—তার নি কোন খবর পাওয়া গেল। ইদিগেও তো দুমাস হতে চলল পেরায়।

কথাটা সত্যি। প্রায় দুমাসই গগন ঘর ছাড়া। এর মধ্যে ছেলে হলো ফুলির। বাপ ছেলের মুখ দেখল না এখনও, এ কেমন অলুক্ষুণে কথা। মন মানে না ফুলির।

ছেলেকে দোল দিতে দিতে মাথা নাড়লেন দুদু মিয়া।

তখনই বলেছিলাম, লোভ করতি হবে না। চলে তো যাচ্চে। না, 'উপারের মাল ইপারে পোঁচে দেয়া খালি। কোন ঝক্কি নেই। বডার সামাল দেবে মহাজন। খালি ছুটে, যাও, আর নে আস, আর নগদ টাকা নে ঘরে ওট। বাস।' এহন দেহ, সেই যে গেল, আর না কী ফেরার নাম কচ্চে। এ বসে তুমাকে রোজগারে বেরতে হচ্চে এহন। কী রকম বেবরাদ্দ লোক গা। একবার যাব না কী, বেণীবাবুর কাচে?

ছবিটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে

গদীতে বসেছিম বেণীমাধব, ডাকসাইটে বেপারী, এপার—ওপার জুড়ে ছড়ানো বাণিজ্য। সব কিছু গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনল সে। তারপর ক্যাশ বাকসে তাল ঠুকতে ঠুকতে গেয়ে উঠল, গুরু নামের বাদামখান। তুল রে সুনার চান। গগনচান নামই তো বললে? তা দেহ, কাম তো আমার কাছে দু-চার জন করে না যে নাম মুখস্ত করে রাখব। তা সে বানচত য দি পঁচিশ দিন আগে বডার পেরিয়েছিল তো এহনও ফেরে না ক্যা? নির্ঘাৎ মাল নিয়ে

সটকেছে। নেবারণ, ইদ্রিসকে আসতে বল।— ও সে মাস্তলের আগায়। থাকে মন চূড়ায়। গুহার সাথে তরী চলেরে। গুরু নামের বাদামখান— এসেছ, বাপধন? উপারে আমরা যত লোক পাটাচ্ছি, তারা সবাই কী ফিরে আসছে, না নাইয়র খাতি বসে যাচ্ছে? ফিরে আসছে বলছ? মাওরা চারজন ফেরে নাই? ক্যা? তারা সিহানে কার ডিমে তা দেচ্ছে? গোলাগুলির মুহে পড়েছিল! এই শালো নচ্ছারের পিতেমহ বি-ডি আর বি-এস-এফ আমার লোকের উপর গুলি চালায় কার অডারে হে? মাসে মাসে ট্যাকাগুলান কী অমনি-অমনি দেয়া হচ্ছে? তুমরাই বা করডা কী? দু-চারখানা ক্যাম্প পোড়ায়া দিতে পারনি? তা লোক চারডে কী মরেছে না কী?

মুখখানা কাচুমাচু করে ইদ্রিস বলে, মনে তো হয় না কত্তা—

'কত্তা' তার কণ্ঠের হুবহু অনুকরণ ক'রে দুদু মিয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, মনে তো হয় না। এখন বাড়ি যাও, মিয়া। জিন্দা থাকলে ঘরে ফিরবে, এর মধ্যে আর কথা কী। এ সব কথা মেয়েটিকে বলা যায় না, বলতে পারেন নি। ছেলেকে ফুলির কাছে ফিরিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে উঠলেন, দড়ি থেকে গামছাখানা টেনে নিয়ে বললেন, এট্টু ঘুরে আসি। দেহি—

বাকী কথাগুলো বললেন না। তবে তার কণ্ঠস্বর থেকে অনুচ্চারিত কথাগুলো বুঝে নিতে পারল ফুলি। বুঝল, গগনের খোঁজেই বেরলেন। ছেলেকে বুকের ওপর চেপে ধ'রে, মুখের কাছে মুখ এনে খুব ঘনিষ্ঠ কণ্ঠে যেন-বা আত্মমগ্ন, এই নবীনা যা ব'লে উঠল, আসতিছে, আসতিছে। সি কী তুমারে না দেহি থাকতি পারে, সুনা—

বলতে বলতে দুচোখ ভ'রে জল এল তার।

দুদু মিয়া যখন বাজারে এলেন, চারধারে তখন প্রবল উত্তেজনা। কে যে কী বলছে, কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। জটলা পাশ কাটিয়ে নকড়ি সাহার দোকানে এসে উঠলেন তিনি।

বিড়ির বেশ বড় কারবারীই নকড়ি। টাটে বসে নাভির গর্তে আঙুল ঘোরাচ্ছিল সে তখন। এটা তার স্থায়ী অভ্যাস। ভুঁড়িটি তার দশাসই। কথা বলার সময়ও মৃদু একটা তরঙ্গ ওঠে।

তার দোকানেও উত্তেজনা। কারিগরদের হাতও যেমন চলছে, মুখও চলছে তেমনি।

তাকে দেখে কেমন এক বিষাদমাখা গলায় নকড়ি বললো, আসেন। বসেন।

খবর সব শুনছেন তো? কইরা-কইম্মা খাইতেছিলাম দুগা, তাও হালাগো সইজ্য হয় না। পিছা কপাইলারা মরেও না। হিশাব কইরা রাখছি। দেখেন—

কী হয়েছে? আতঙ্কে গলা যেন বুজে এল দুদু মিয়ার। সামনের কাগজ-খানা তাকিয়েও দেখলেন না।

আর কী, বুচকা-বুচকী বাইন্ধা ছ্যাশের নামে মেলা দেন আবার। আপনেরা তো বিদেশী। হমুন্ধীর পুইতেরা এইবার বিদেশী না খেদাইয়াই ছাড়ব না।

নকড়ির রাগটা খাঁটি। এইসব অস্থায়ী মানুষগুলোকে দিয়ে খুব কম পারিশ্রমিকে কাজ করিয়ে নেয়া যায়। দর-দস্তুর নিয়ে অবাধ্যতা করলে পুলিশের ভয় দেখিয়ে সহজেই কাবু করা যায়। সুসময় ছেড়ে যাচ্ছে আজ। ছেড়ে যাচ্ছে নয়, তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে তাকে। বুকের ভেতরটা টনটন ক'রে ওঠে তার। হিসেব মিটিয়ে দিয়ে দুদু মিয়ার হাত চেপে ধ'রে কেঁদেই ফেলল সে, আসবেন আবার।

জলা থেকে মুখ তুলে কম বয়সী একটি ছেলে ফিক ক'রে হেসে ফেলল, দরাজ গলায় গেয়ে উঠল, রাধার বিরহে চন্দ্রাবলীর/নেংটি ভিজে যায় রে-এ-এ…

দোকান থেকে যেন বেরিয়ে আসতে পারেন না দুদু মিয়া। পা জোড়া যেন পাথর, চোখের সামনে কী সব নেচে নেচে ওঠে— অস্পষ্ট ধোঁয়া ধোঁয়া। এই সময় বড় বেশি ক'রে গগনের কথা মনে পড়ে। কোথায় রইল ছেলেডা? তাকে থুয়ে কোথায়ই বা যান এখন?

এই সময় দূর থেকে কে যেন পরিত্রাহি চেঁচায়, চাচা গ, অ চাচা—

কেডা, হোই?— দোকানের সিঁড়ি থেকেই হেঁকে ওঠেন।

প্রায় ছুটতে ছুটতেই এল রুস্তম, হাঁপধরা গলায় বলল, শুনেচ?

ম্লান হাসলেন দুদু মিয়া, ই আর নূতন কী? চল, বারায়ে পড়ি।

সি কথা না—

তবে?

গগন নাই গ—

ক্যান, নাই ক্যান!—কেমন এক নির্বোধ দৃষ্টি মেলে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অদূরে, মহাসড়কের ধার ঘেঁষে গড়ে ওঠা ঝুপড়িগুলোতে এ-বাংলার গরিব-গুর্বোরা ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন। কেননা, তারা জানে, এই সব সময় নামমাত্র দামে ওগুলো ছেড়ে দেয় তারা।

দেখে হাঁট গ। মেলাই পথ সামনে। এখনই উল্টা খেলে চলে?

রুস্তমের গলা। কেউ হোঁচট খেল হয়তো। আলপথ ধরে চলার এই এক অসুবিধে, বিশেষ করে রাতে। একটু অসতর্ক হলেই শরীর টাল খেয়ে যায়, পা হড়কে পড়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

রাত এখন গভীর। সপ্তর্ষিমণ্ডল মাঝ আকাশ ছাড়িয়ে চ'লে গেছে। চরাচর জুড়ে এক বিষণ্ণ স্তব্ধতা। খুব নিঃশব্দে হাঁটছে তারা। এত নিঃশব্দে যে কান পাতলে নিশ্বাসের ওঠাপড়াটুকুও যেন শোনা যায়। মনে হয়, যেন বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ ক'রে একদল শ্মশানযাত্রীই ফিরে যাচ্ছে।

তিন বছর পর এই ফেরা। কোথায় ফিরছি? দুদু মিয়া ভাবেন। কোথায় সেই দেশ আমাদের, জীবন যেখানে ছলবল? যেখানে পাকা ঠিকানায় মরণইস্তক বসতি?

হঠাৎ পেছনে নজর পড়তেই দেখেন, ফুলি নেই। বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো দুদু মিয়ার। মুহূর্তেই উর্ধ্বশ্বাসে পেছনপানে ছুটলেন। বাঁক ফিরতেই দেখলেন, ফুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই গাছ-তলায় যেখানে এ-পারের ইস্টিকুটুমের বাস। দাঁড়িয়ে রয়েছে পেছন ফিরে। যেন শেষবারের মত দেখে নিচ্ছে সেই বিদেশ ভুঁই যেখানে গগনকে চিতাশয্যায় রেখে এল। থুইয়ে এল তার শাঁখা-সিঁদুর।

তার পাশে এসে দাঁড়ালেন তিনি। ধীরে ধীরে মাথায় হাত রাখলেন। কেঁপে উঠল ফুলি, তারপর অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ল।

চুপ করে থাকেন দুদু মিয়া। মানুষের দেয়া এই শোকের সান্ত্বনার ভাষা তিনি জানেন না। তবু এক সময় তাকে বলতে হয়, আর যে দেরি করলি চলে না, মা—

চলে না, কারণ, এ. এমন এক সর্বনাশা কালের হাতে বন্দী তারা, যেখানে শোকের জন্যও দুদণ্ড অবসর নেই।

খানিকবাদেই নিজেকে সামলে নিল ফুলি। ছেলেকে বুকের ওপর আঁকড়ে ধ'রে খুব শান্ত গলায় বলল, আর এ দেশে আসব না, জেটা। এ বড় রাক্ষুসে দেশ গ— বলে দ্রুত পায় এগিয়ে গেল।

বুকের ভেতরটা ধ্বক ক'রে উঠল দুদু মিয়ার। চোখের কোণ-দুটো চিকচিক ক'রে জলে উঠল।

ওই তার জন্মভূমি। ওখানেই মেয়েটা রেখে গেল তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তিনি নিজে কী কিছু রেখে যাচ্ছেন? কথাটা মনে হতেই প্রবল এক দাহ শরীরমনে হিলহিল ক'রে ছড়িয়ে পড়ল তার। ক্ষিপ্ত কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলেন, না, আমি কিছু রেখে যাচ্ছি নে। কাঁচাখেকো, মর, মর তুই। নাস্তি, নাস্তি, এই নাস্তি তোর মুখে— বলতে বলতে আলপথের ওপর সবেগে লাথি মারতে লাগলেন।

দু বাংলার প্রান্তীয় বাতাসে গমগম ক'রে বাজতে থাকল সে-কণ্ঠ, নাস্তি, নাস্তি তোর মুখে—

আমাদের বই

শমীন্দ্র ভৌমিকের 'তোর সঙ্গে আড়ি' ছয় টাকা

প্রকাশিতব্য

অনীক রুদ্রের কাব্যগ্রন্থ 'চিরহরিৎ অরণ্য অঞ্চল'

অমিত সরকার অভিজিৎ ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্র ভৌমিকের প্রবন্ধ সংকলন

অন্বর্থ প্রকাশন

৫৩/১এ প্রিন্স গোলাম হোসেন শাহ্ রোড

কোলকাতা-৭০০ ০৫২

নতুন কবিতার বই

জয় গোস্বামীর

উন্মাদের পাঠক্রম ৮.০০

ভাস্কর চক্রবর্তীর

দেবতার সঙ্গে ৬.০০

পরিবেশক

প্যাপিরাস ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন কলকাতা ৭০০ ০০৪

এইসব পত্র পত্রিকা পড়ুন

অগ্রণী

কবিতা কথা

সত্তর দশক

কালধ্বনি

পট

বিদ্বেষপূর্ণ যুক্তির যতই অবতারণা করা হোক-না কেন তবু এটা মিথ্যা যে 'নিম্ন' বর্ণের লোকদের শিক্ষা দিয়ে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করা যায় না। সম্ভ্রান্ত পরিবারের ও অনগ্রসর নোম্যাডিক পরিবারের (Nomadic) গড় সামর্থ্যের সন্তান-সন্ততির মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য নেই। যদি উভয়েই একই গৃহে লালিত হয়, একই স্কুলে শিক্ষা পায় তখনই কেবল ব্যক্তিগত পারদর্শিতা স্থির করবে কে এগিয়ে যাবে।

—আনাতোলি লুনাচারস্কি

৫৩/১ এ প্রিন্স গোলাম হোসেন শাহ্ রোড কলকাতা ৩২
থেকে অভিজিৎ ঘোষ -প্রকাশিত এবং টেকনোপ্রিন্ট
কলকাতা ৪ থেকে মুদ্রিত।